হুমায়ূন আহমেদ

এলেবেলে

উন্মাদ পত্রিকার পক্ষথেকে যখন হুমায়ন আহমেদকে 'এলেবেলে' লেখার অনুরোধ করা হল তখন তিনি বললেন "আমার সমস্ত লেখাই এলেবেলে। আমি আবার আলাদা করে এলেবেলে কেন লিখব?" তবু তিনি লিখলেন। সেই লেখাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। কারণ আমরা মনে করি বাংলা সাহিত্যের রম্য রচনায় 'এলেবেলে' কে স্থান দিতেই হবে। সাময়িক পত্রিকায় হারিয়ে যাবার মত লেখা এগুলি নয়।

সম্প্রতি একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম। এলেবেলে লেখা সেটা দিয়েই শুরু করা যাক।

বৈশাখী মেলায় গিয়েছি চার কন্যাকে সঙ্গে করে। তিনটি আমার নিজের, অন্যটি ধার করা। গিয়ে দেখি কুম্ভমেলার ভিড়—ঢাকা শহরের অর্ধেক লোক এসে উপস্থিত। মাটির হাঁড়িকুরি যাই দেখছে তাই তারা কিনে ফেলছে। অনেকটা কচ্ছপের মত দেখতে কি যেন বিক্রি হচ্ছে খুব সস্তায়—এক টাকা পিস। সবাই কিনছে, আমিও কিনলাম। তারপর কিনলাম দু'খানা রবিঠাকুর। এবারের মেলায় রবিঠাকুর খুব সস্তায় বিক্রি হচ্ছে চার টাকা জোড়া। আমার ছোট মেয়েটি রবিঠাকুরকে নিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। তার কিছু হল না মহাকবি দু'টুকরা হয়ে গেলেন। কান্না থামাবার জন্যে আরেকটি কিনতে হয়। কিন্তু একবার কোন দোকান ছেড়ে এলে আবার সেখানে ঢোকা অসম্ভব। অন্য একটি ঘরে উঁকি দিলাম। বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, আপনাদের রবিঠাকুর আছে? দোকানী আমাকে বেকুব ঠাওড়ালো কিনা জানি না এক বুড়োর মূর্তী ধরিয়ে দিল। বুড়োটি খালি গায়ে বসে আছে হাতে হুঁকো। বাতাস পেলেই সমানে মাথা নাড়ছে। সাদা চুল সাদা দাড়ি—রবিঠাকুর যে এতে সন্দেহের কিছুই নেই।

আমরা তালের পাখা কিনলাম, মাটির কলস কিনলাম। সোলার কুমীর কিনলাম (কিছুক্ষণের মধ্যেই টিকটিকির মত এর ল্যাজ খসে পড়ল)। দড়ির শিকা, বাঁকা হয়ে দাঁড়ানো (কলসি কাঁখে) বিশাল বক্ষা বঙ্গ ললনা কিনলাম। আমার কন্যারা দেখলাম দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি গাঢ় অনুরাগ নিয়ে জন্মেছে। যাই দেখছে তাই তাদের চিত্তকে

উদ্বেলিত করছে তাই তারা কিনবে। এক সময় এদের পিপাসা পেয়ে গেল। চারজনের জন্যে চারটি কাঠি আইসক্রিম কেনা হল। যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির কথা শুরুতে বলেছি সেটা শুরু হল তখন।

মেজো মেয়ে তার আইসক্রিম আমার দিকে বাড়িয়ে বলল এক কামড় খাও বাবা। আমি খেলাম এক কামড়। একজন যা করে অন্য সবারও তাই করা চাই—কাজেই অন্য সবাইও আইসক্রিম বাড়িয়ে ধরতে লাগল আমার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ঘিরে ছোটখাট একটা ভিড় জমে উঠল। দৃশ্যটি অদ্ভুত। চারটি ছোট ছোট মেয়ে আইসক্রিম হাতে দাঁড়িয়ে আছে এবং একজন বয়স্ক লোক কপ্ কপ্ কচ্চর সবার আইসক্রিমে কামড় দিচ্ছে। যেন আইসক্রিম খাওয়ার কোন একটা কম্পিটিশন। এর মধ্যেই লক্ষ্য করলাম অচেনা একটা ছেলে তার বাবাকে বলছে, "বাবা, আমিও ঐ লোকটাকে আইসক্রিম খাওযাব।" ছেলের হাতেও একটা আইসক্রিম। ভয়াবহ পরিস্থিতি! ছেলেটির বাবা আমাকে বিনীত ভঙ্গিতে বললেন—ভাই কিছু মনে করবেন না। এর আইসক্রিমটায় একটা কামড় দেন। ছেলে মানুষ একটা আব্দার করছে।

এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতিকেই বোধ হয় বেকায়দা অবস্থা বলা হয়। এটা এমন একটা অবস্থা যাকে কিছুতেই কায়দা করা যায়

না। অথচ এমন অবস্থায় আমাদের প্রায় রোজই পড়তে হয়। একবার এক মফস্বল শহরে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল প্রধান অতিথি করে (খুব সম্ভব গুরুত্বপূর্ণ কাউকে তারা রাজি করাতে পারেনি)। অনেক বক্তৃতা-টক্তৃতার পর শুরু হল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। প্রথমেই একক নৃত্য-জলে কে চলেলো কার ঝিয়ারি। চৌদ্দ পনেরো বছরের এক বালিকা কলসি কাঁখে উপস্থিত হল। বিশাল কলসি পানিতে কানায় কানায় ভরা। নাচের তালে তালে ছলকে ছলকে পানি পড়ছে। রিয়েলিস্টিক টাচ্ দেবার একটা মফস্বলী প্রচেষ্টা। আমি অবাক হয়ে ভাবছি জলভর্তি কলস নিয়ে জল আনতে যাবার প্রয়োজনটি কি ঠিক? তখন কলসি নিয়ে সে আছাড় খেলো। ছোটখাট একটা বান ডেকে গেল স্টেজে। প্রধান অতিথি এবং সম্মানিত সভাপতি যেহেতু স্টেজেই উপবিষ্ট ছিলেন কাজেই তাদেরকেও সেই জল স্পর্শ করল। দর্শক মহলে তুমুল আনন্দ ও উত্তেজনা—"ওয়ান মোর" "ওয়ান মোর" ধ্বনি। অনুষ্ঠান শেষে আমি ভিজা প্যান্ট নিয়ে বাসে উঠলাম। বাসের সমস্ত যাত্রী খুব সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো আমার দিকে। যার পাশে বসলাম সে অনেকখানি সরে বসল।

এটা হচ্ছে বড় ধরনের বেকায়দার গল্প। ছোট ধরনের বেকায়দাও প্রচুর ঘটছে। আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে। একটা উদাহরণ দিলেই আপনারা ধরতে পারবেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান কি আপনারা কখনো মন দিয়ে লক্ষ্য করেছেন? ঠিক আছে, দৃশ্যটি কল্পনা করুন—গুরুগম্ভীর একজন সভাপতি পুরস্কার দিচ্ছেন। পুরস্কার নিচ্ছে একটি তরুণী। সভাপতি ভাবলেন যেহেতু মেয়ে কাজেই সে নিশ্চয়ই হ্যাণ্ডশেক করবে না। মেয়েটি হ্যাণ্ডশেক করতে গিয়ে লজ্জিত হয়ে লক্ষ্য করল সভাপতি হাত বাড়াচ্ছেন না। সে লাল হয়ে হাত নামিয়ে নিল। ততক্ষণে সভাপতি হাত বাড়িয়েছেন। মেয়েটি হাত নামিয়ে ফেলেছে দেখে তিনিও ঈষৎ লাল হয়ে হাত নামালেন। ইতিমধ্যে মেয়েটি হাত বাড়িয়েছে। সমগ্র দর্শক দারুণ টেনশনে ঘটনার পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করছে।

বেকায়দা পরিস্থিতির ব্যাখ্যার জন্যে আবার শিশুদের কাছে ফিরে যাই। আমার ধারণা [এবং বদ্ধমূল বিশ্বাস] শিশুরা বড়দের প্রতি আক্রোশ বসত কিছু কিছু পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এর পেছনে শিশু-সুলভ সারল্য-ফারল্য বলে কিছু নেই। জনৈকা ভদ্রমহিলা খুব দুঃখ করে একটা ঘটনা বললেন—তিনি এক বাসায় বেড়াতে গিয়েছেন।

দেখলেন তিন বছর বয়েসী একটি ছেলে 'পটি'তে বসে বাথরুম সারছে। ছেলেটি তাকে দেখে লজ্জা পেয়েছে ভেবে তিনি বললেন, "বাহ্ খুব সুন্দর পটি তো তোমার! ভারী সুন্দর। আমি এত সুন্দর পটি জন্মেও দেখিনি।" ছেলেটি কোন কথা বলল না। গম্ভীর হয়ে রইল। নাশতা-টাসতা দেয়া হয়েছে এমন সময় ছেলেটি এসে ঘোষণা করল পটিটি সে সম্মানিত অতিথিকে দিয়ে দিয়েছে। এখন অতিথিকে সেখানে বসে বাথরুম করতে হবে। ছেলের মা বিব্রত হয়ে বললেন, "ছিঃ লক্ষ্মীসোনা এসব কি বলে? তোমার খালা হয় না?"

কিন্তু ততক্ষণে ওর মাথায় ব্যাপারটা ঢুকে গেছে। কাজেই সে হাত-পা ছুঁড়ে বিকট চিৎকার শুরু করেছে। চায়ের কাপটাপ উল্টে ফেলছে। তাকে সামলাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলাকে 'পটি'তে বসার একটা ভঙ্গি করতে হল।

অনেকেই বলেন শিশুরা সত্যবাদী হয়। আমার মনে হয় না কথাটা ঠিক। তারা সত্যি কথা বলে তখনি যখন কাউকে বিব্রত করার প্রয়োজন হয়। ঘটনাটা বলি। একজন সংস্কৃতিবান মহিলাকে আমি চিনতাম যিনি আমার লেখালেখি নিয়ে নানান সময় উচ্ছাস প্রকাশ করছেন। মাঝে-মধ্যেই যেতাম তাঁর বাসায় সাহিত্য, তার উদ্দেশ্য এইসব নিয়ে উচ্চমার্গের কথাবার্তা হত। সেদিনও তাঁর বাসায় গিয়েছি। বাংলাদেশে কেন তুর্গেনিভের মত বড় উপন্যাসিকের জন্ম হল না এই নিয়ে কথা হচ্ছে। এমন সময় তাঁর ছোট মেয়েটি হঠাৎ কথা বলল—চাচা, আম্মু না আপনাকে ছাগল ডাকে।

অধিক শোকে পাথর বলে যে কথাটা প্রচলিত আছে সেটা মিথ্যা নয়। ভদ্রমহিলা পাথর হয়ে গেলেন। তুর্গেনিভ প্রসঙ্গ আর জমল না।

এলেবেলে লেখা শেষ করার আগে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি নিয়ে একটি ফরাসি রসিকতা বলি। একজন ফরাসি তরুণী (..... .....) সন্ধ্যাবেলা তার কুকুরটিকে নিয়ে পার্কে হাঁটতে গেছেন। সেখানে দেখা হল এক বুড়োর সঙ্গে। বুড়োটিও একটি কুকুর নিয়ে পার্কে এসেছে। না এই রসিকতাটি বলা যাবে না। রসিকতাটা প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যে এবং আমার ধারণা উন্মাদের পাঠক-পাঠিকারা সবাই অপ্রাপ্তবয়স্ক। এই গল্প তারা হজম করতে পারবে না।

এবারের এলেবেলে লেখা আমার ভাগ্নিকে নিয়ে। ওর ডাক নাম লীনা। ভাল নাম হানিফা খাতুন, আমার নানাজানের রাখা। মুরুব্বী মানুষের রাখা নাম কাজেই হজম করতে হচ্ছে। যদিও বান্ধবীরা তাকে হানিফ সংকেত বলে ডাকা শুরু করেছে। বান্ধবীদেরও দোষ নেই। হানিফ সংকেতের সঙ্গে লীনার চেহারার কিছুটা মিল আছে।

লীনা এবার মেট্রিক পাস করেছে। যে বিষয়টি সে সবচে' কম জানে (সাধারণ গণিত) তাতেই লেটার পেয়ে যাওয়ায় ঘাবড়ে গিয়েছিল। এখন সামলে উঠেছে।

মেট্রিক (থুক্কু, এখনতো আবার এস,এস,সি, বলা নিয়ম) পাস হবার পরপরই সব মেয়েরা খানিকটা আহলাদী হয়ে পড়ে। লীনার মধ্যেও তা দেখা গেল। সে কথা বলতে লাগল টেনে টেনে এবং খানিকটা নাকি সুরে। আমি কড়া গলায় বললাম—কিরে এমন টেনে টেনে কথা বলছিস কেন?

লীনা চোখ বড় বড় করে বলল, 'কখন টেঁ—নে টেনে কথা বললাম?'

ঃ এইত বলছিস। ঠিকমত কথা বল নয়ত চড় খাবি।

ঃ দাঁও চড় দাঁ—ও।

ঃ শোন লীনা, নাক দিয়ে কথা বলছিস ব্যাপারটা কি? নাক নিঃশ্বাস নেবার জন্যে কথা বলবার জন্যে না। সর্দি লাগলে কি করবি? তখনতো কথা বলা বন্ধ হয়ে যাবে। মুখে কথা বলার অভ্যাসটা বজায় রাখ।

লীনা, খানিকক্ষণ মূর্তির মত বসে রইল তারপর হেঁচকি তুলে কাঁদতে লাগল। ঘটনাটি সকাল বেলার। সারাদিন তারপর কি ঘটেছে

আমি জানি না। একটা কাজে নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিলাম। রাত আটটায় বাড়ী ফিরেই শুনলাম লীনা এক বোতল ডেটল খেয়ে ফেলেছে। তাকে নেয়া হয়েছে হাসপাতালে। ডাক্তাররা স্টমাক ওয়াস করাচ্ছেন। এত খাবার জিনিস থাকতে সে এক বোতল ডেটল কেন খেল জিজ্ঞেস করায় সে বলেছে—বড় মামা আমাকে ইনসাল্ট করেছে এইজন্যে খেয়েছি। আমি বাঁচতে চাই না। মরতে চাই।

এই হচ্ছে এ যুগের সুপার সেনসিটিভ বালিকাদের একটি নমুনা।

আমাদের পাশের ফ্লাটের স্বাতীর কথা বলি। বখশি বাজার কলেজে পড়ে। মাথাভর্তি চুল। খোপা খুলে দিলে চুলের গোছা হাঁটু ছেড়ে নিচে নেমে যায়। একদিন তার মা বললেন, কিরে তুই সব সময় চুল এমন এলোমেলো করে রাখিস খোপা করে রাখতে পারিস না?

স্বাতী গনগনে মুখে বলল, লম্বা চুল অসহ্য। ভাল্লাগেনা।

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, এত অসহ্য হলে কেটে ছোট কর কিন্তু পাগলীর মত থাকিস না।

স্বাতী তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে তার বাবার শেভিং

রেজার দিয়ে মাথা কামিয়ে ফেলল। তারপর আয়নায় নিজের "মতী" দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে বাঁ হাতের হাড় ভেঙ্গে ফেলল।

স্বাতীর চুল এখন খানিকটা বড় হয়েছে। ছোট ছোট চুলেও তাকে ভালই দেখায় কিন্তু আমাদের পাড়ার সমস্ত বালক-বালিকারা তাকে ডাকে 'কোজাক আপা।' এই নাম তার কোনদিন ঘুচবে এমন মনে হয় না।

আমার বন্ধু মিসির আলী সাহেবের গল্পটা বলি। মিসির আলী সাহেব থাকেন নিউ এ্যালিফেন্ট রোডে। গত শীতের ঘটনা। তিনি ঘরে বসে টিভিতে নবীন শিল্পীদের গানের অনুষ্ঠান দেখছেন এমন সময় দরজার কড়া নড়ল। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন পনেরো-ষোল বছরের ম্যাক্সি পড়া একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন, কাকে চাও মা?

মেয়েটি সরু গলায় বলল, আপনাদের কি কোন কাজের লোক লাগবে?

ঃ তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কিসের কাজের লোক?

ঃ আমি বাড়ী থেকে চলে এসেছি। এখন আমি মানুষের বাড়ীতে কাজ করে খাব। আমাকে রাখবেন?

ঃ বাড়ীতে ঝগড়া হয়েছে?

ঃ হ্যাঁ। ড্যাডি আমাকে বকা দিয়েছে।

ঃ এসো ভিতরে এসে বস। দেখি কি করা যায়।

মেয়েটি খুব সহজেই ভেতরে এসে বসল। নিজেই ফ্রীজ খুলে কোকের বোতল বের করল। সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সোফায় পা তুলে টিভি দেখতে লাগল। মিসির আলী সাহেবের স্ত্রী নিউমার্কেট থেকে রাত আটটায় বাড়ী ফিরে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। ষোল বছরের একটি অপরিচিতা মেয়ে সোফায় আধশোয়া হয়ে আছে। তার দৃষ্টি টিভিতে নিবদ্ধ। মাঝে মাঝে কোকের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। মিসির আলী পাগলের মত একের পর এক টেলিফোন করে যাচ্ছেন। মেয়েটি কোত্থেকে এসেছে কি কোনই হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়ে নির্বিকার। দিব্যি পা নাচাচ্ছে। মিসির আলী সাহেবের স্ত্রীকে এক ফাঁকে শুধু বলল—আন্টি ডিনারে কি রান্না হয়েছে? আমি কিন্তু ঝাল কম খাই।

'দিন-কাল পাল্টে গেছে'—এ কথাটি সবার মুখেই শোনা যায় কিন্তু কি পরিমাণ পাল্টেছে তা বলতে পারেন টিন এজারদের বাবা-মা। আমার মামাতো বোন বিনুর কথাটা বলি। টিন এজার বলা ঠিক হবে না অনার্স ফাইনাল দিয়েছে। একদিন দেরী করে বাসায় ফিরল।

মেয়ের মা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলেন—দুই কানেই নানান জায়গায় ফুটো করা হয়েছে। কান দু'টি দেখাচ্ছে মুরব্বার মত। তিন-চার জায়গায় ফুটো করে গয়না পরাই নাকি এখনকার স্টাইল।

গত রমজানের ঈদে তার সঙ্গে আমার দেখা। কানের বিভিন্ন জায়গা থেকে গয়না ঝুলছে [দুল না বলে গয়না বলছি, কারণ যে সব জিনিস ঝুলছে তার কোনটাকেই দুলের মত লাগছে না। একটি দেখতে ঘন্টার মত তার ভেতর থেকে কালো সুতা বের হয়ে এসেছে।]

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে বিনু বলল, এরকম করে তাকিও না ভাইয়া, চারটা করে ফুটো করা এখানকার স্টাইল; আমি মোটে তিনটে করিয়েছি।

আমি বিস্ময় গোপন করে বললাম, স্টাইল যখন উঠে যাবে তখন তুই কি করবি? ফুটো বন্ধ করবি কিভাবে?

বিনু বড়ই বিরক্ত হল। কিন্তু সে জানেনা বাংলাদেশে চোখ ধাঁধানো স্টাইল কোনটিই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এটিও হবে না। বাড়তি ফুটো নিয়ে মেয়েগুলি বড়ই অশান্তিতে পড়বে। কিংবা কে জানে হয়ত এখনি পড়েছে। মাথার চুল দিয়ে কান ঢেকে রাখতে হচ্ছে।

লেখা শেষ করবার আগে আবার আমার ভাগ্নির কাছে ফিরে যাচ্ছি। তার ডেটল ভক্ষণের পর থেকে সবার আচার-আচরণে একটা পরিবর্তন হল। সে যা বলে সবাই তাই শুনে। সেনসেটিভ মেয়ে আবার যদি কোন কাণ্ডটাণ্ড করে বসে। তার এবং তার মায়ের কথাবার্তার কিছু নমুনা দিচ্ছি।

মেয়েঃ আজ আমি কলেজে যাব না।

মা ঃ ঠিক আছে মা, যেতে হবে না।

মেয়েঃ আমাকে একটা সাইকেল কিনে দেবে? আমি এখন থেকে সাইকেলে করে কলেজে যাব।

মা ঃ বিকেলে, নিউমার্কেট গিয়ে কিনে নিস। তোর বাবাকে বলে দেব।

বাসার অবস্থাটা বোঝানোর জন্যে এই ডায়ালগ ক'টিই যথেষ্ট। গত বুধবারে গিয়েছি ওদের ওখানে দেখি এক বখা ছেলে ড্রইংরুমে বসে আছে। ছোকরার গেঞ্জিতে লেখা "পুশ মি"। তার হাতে সিগারেট। সে সিগারেট টানছে দম দেয়ার ভঙ্গিতে। ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার।

আমি আপাকে বললাম ঐ চীজটি কে?

আপা গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফিস ফিস করে বলল, "ও লীনার একজন চেনা ছেলে। তুই লীনাকে কিছু বলিস না। সেনসেটিভ মেয়ে কি করতে কি করে বসবে। আমি ভয়ে ভয়ে থাকি।"

আমি কিছুই বললাম না। গুম হয়ে বারান্দায় বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পরই উজ্জ্বল চোখে লীনা ঢুকলো। হাতটাত নেড়ে বলল, "মামা. কি কান্ড হয়েছে দেখে যাও। সবুজ একটা চিরুনী দিয়ে তার দাড়িতে আচড় দিতেই তেরটা উকুন পড়েছে। এদের মধ্যে চারটা লাল রঙের। প্লীজ মামা দেখে যাও।"

আমি কঠিন মুখে বসে রইলাম। আপা মৃদুস্বরে বলল, "যা দেখে আয়। এত করে বলছে। সেনসেটিভ মেয়ে।'

আমি দেখতে গেলাম। টেবিলের উপর একটা সাদা কাগজ। সেখানে সত্যি সত্যি তেরটা মিডিয়াম সাইজের উকুন। কয়েকটির পেট লালাভ।

সবুজ আমাকে দেখে দাঁত বের করে, বলল মামার কাছে সিগ্রেট আছে? আই এ্যাম রানিং শর্ট।

আমাদের পাড়ায় মজিদ সাহেব নামে একজন রিটায়ার্ড পুলিশের এস পি থাকেন। তাঁর স্বভাব হচ্ছে দেখা হওয়া মাত্র অত্যন্ত চিন্তিত মুখে 'হাই ফিলসফি' গোছের একটা প্রশ্ন করা। মহা বিরক্তকর ব্যাপার। সেদিন মোড়ের দোকানে সিগারেট কিনছি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম মজিদ সাহেব হন হন করে আসছেন। আমি চট করে একটু আড়ালে চলে গেলাম। লাভ হল না। ভদ্রলোক ঠিক আমার সামনে এসে ব্রেক করলেন এবং অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন, প্রফেসার সাহেব, মানুষ হাসে কেন একটু বলুন তো।

আমি বিরক্ত চেপে বললাম, হাসি পায় সেই জন্যে হাসে।

ঃ হাসি কেন পায় সেইটাই বলুন।

এত মহা যন্ত্রণা। ভদ্রলোক যেভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তাতে মনে হচ্ছে জবাব না শুনে তিনি যাবেন না। তাঁর না হয় কাজকর্ম নেই, রিটায়ার্ড মানুষ কিন্তু আমারতো কাজকর্ম আছে। আমি বললাম, মজিদ সাহেব আমি আপনাকে একটা গল্প বলি। গল্পটা শুনে আপনি হাসবেন। তারপর আপনি নিজেই চিন্তা করে বের করবার চেষ্টা করুন কেন হাসলেন।

ঃ এটা মন্দ নয়। বলুন আপনার গল্প।

আমি গল্প শুরু করলাম--এক লোক একটি সিনেমা একত্রিশবার দেখেছে শুনে তার বন্ধু বলল, একত্রিশ বার দেখার মত কি আছে এই সিনেমায়? লোকটি বলল, সিনেমার এক জায়গায় একটি মেয়ে নদীতে গোসল করতে যায়। সে যখন কাপড় খুলতে শুরু করে ঠিক তখন

একটা ট্রেন চলে আসে। আমি একত্রিশবার ছবিটা দেখেছি কারণ আমার ধারণা কোন না কোনবার ট্রেনটা লেট করবে।

মজিদ সাহেব আমার দিকে হা করে তাকিয়ে রইলেন। অবাক হওয়া গলায় বললেন—ট্রেন লেট হবে কেন? প্রতিবারতো একই ব্যাপার হবে।

আমি বললাম, হাসিটাতো এই খানেই।

: একই ব্যাপারে প্রতিবারই ঘটেছে এরমধ্যে হাসির কি?

মজিদ সাহেব গম্ভীর মুখে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। মনে হল আমার উপর খুব বিরক্ত। আমি যে অভিজ্ঞতার কথা বললাম এ জাতীয় অভিজ্ঞতা আপনাদের সবারই নিশ্চয়ই আছে। অনেক আশা নিয়ে একটি রসিকতা করলেন সেই রসিকতাটা ব্যাঙের মত চেপ্টা হয়ে পড়ে গেল।

আমেরিকান এক বইতে একশটি রসিকতা দেওয়া আছে এবং বলা হয়েছে এই রসিকতাগুলির সাফল্যের সম্ভাবনা শতকরা নিরানব্বই দশমিক তিন দুই ভাগ। আমি এর একটা এক বিয়ে বাড়ীর আসরে চেপ্টা করে পুরোপুরি বেইজ্জত হয়েছি। একজন শুধু আমার প্রতি করুণার বশবর্তী হয়ে একটু ঠোঁট বাঁকা করেছিলেন কিন্তু অন্যদের গম্ভীর মুখ দেখে সেই বাঁকা ঠোঁট সোজা করে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। জনৈকা তরুণী চশমার ফাঁক দিয়ে এমনভাবে আমাকে দেখতে লাগল যেন আমার মাথায় দোষ আছে।

গল্পটা এরকম।

এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে জিজ্ঞেস করছে—ফ্রান্স শহরটা কেমন?

বন্ধু বলল, ভাল। সেখানে এয়ারপোর্টে নেমে তুই যদি একটা মোটর গাড়ি ভাড়া করিস তাহলে দেখবি সেই ড্রাইভার তোর সঙ্গে কি ভদ্র ব্যবহার করছে। এমনও হতে পারে সে তোকে তোর বাড়ীতে নিয়ে যাবে। রাখবে তার বাড়ীতে। নাচ-গান করবে। এবং এই যে তুই তার বাড়ীতে থেকে এত আনন্দ ফুর্তি করলি, তার জন্যে উল্টা তোকে এক গাদা টাকা দিবে।

: বলিস কি? তুই গিয়েছিলি নাকি ফ্রান্সে?

: আমি যাইনি, আমার বৌ গিয়েছিল। তার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স। সেতো আর বানিয়ে বানিয়ে বলবে না। এরকম মেয়েই সে নয়।

এই গল্পে কেউ হাসল না কেন? আমি ভেবে টেবে বের করলাম,

এরকম একটি ভেন্দা যুবকের এমন বউ থাকতেই পারে না যে একা একা ফ্রান্সে যাবে। এই কারণেই গল্পটি কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। কি যন্ত্রণা, হাসির গল্পের আবার বিশ্বাসযোগ্যতা কি? আমাদের মুশকিল হচ্ছে সিরিয়াস গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। হাসির গল্প হলেই গম্ভীর হয়ে ভাবতে বসি গল্পটি কি বিশ্বাসযোগ্য? ভেন্দা ধরনের ছেলেটার বউ ফ্রান্সে কেন গেল?

রসিকতা যারা করেন তারা বেইজ্জত হবার আশংকা মাথায় নিয়েই করেন। নো রিস্ক নো গেইনের ব্যাপার এবং দু'একটা যখন লেগে যায় তাদের উৎসাহের সীমা থাকে না। রসিকতা করাটাকে তখন তাঁরা পবিত্র দায়িত্ব মনে করেন। আগাড়ে বাগাড়ে রসিকতা করে আশেপাশের মানুষদের বিরক্তির চরমসীমায় পৌঁছে দেন। আমি একবার শ্যামলী থেকে গুলিস্তান যাবার পথে এরকম একজনের দেখা পেয়েছিলাম। বাসে অসম্ভব ভিড়। প্রচণ্ড গরম। ঘামের কটু গন্ধ। এর মধ্যে একজন তার পরিচিত একজনকে পেয়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এই মোজাম্মেল একটা চুটকি শোন; একবার এক বিয়ে বাড়ীতে বরযাত্রী আসতে দেরী করছে তখন বরের ফুপাতো বোন...

মোজাম্মেল যার নাম সে একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তাতে লাভ হল না। ভদ্রলোক দীর্ঘ গল্প শেষ করে দ্বিতীয় গল্প শুরু করলেন। টাক-মাথার এক লোক বিরক্ত হয়ে বললেন, চুপ করেনতো ভাই।

ঃ কেন চুপ করব? আপনার কি অসুবিধা করলাম?

ঃ কানের কাছে ভ্যান ভ্যান করছেন এটা অসুবিধা না?

ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। সায়েন্স ল্যাবরেটরী পর্যন্ত এসেই আবার তার গলা খুস খুস করতে লাগল। তিনি মোজাম্মেলকে তিন নম্বর রসিকতাটি বললেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার এই রসিকতাটি হিট করল। বাসশুদ্ধ লোক হু হু করে হেসে উঠল। এমনকি সেই টাক-মাথার ভদ্রলোক ঠা ঠা জাতীয় বিচিত্র শব্দ করে হাসতে লাগলেন।

অবশ্যি এ সংসারে কিছু ভাগ্যবান লোক আছেন, তাঁদের সব রসিকতাই "পাবলিক খায়।" এটা বিরাট একটা যোগ্যতা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যারা এই যোগ্যতা অর্জন করেন অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদেরকে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে যেতে দেখা যায়। জীবনের প্রতি সব রকম আকর্ষণ হারিয়ে ফেলতে থাকেন। চল্লিশ না হতেই তাদের

দেখা যায় পঞ্চাশের মত। কারণ খুব সহজ, এই জাতীয় জন্ম-রসিক-দের সব কথাকেই আমরা সবাই রসিকতা হিসাবে নেই। যা এক সময় জন্ম-রসিকের উপর মানসিক চাপ ফেলতে শুরু করে। উদাহরণ দেই, আমার এক বন্ধু আব্দুস সোবাহান একজন জন্ম-রসিক। স্কুল জীবন থেকে সে আমাদের হাসাচ্ছে। কলেজ জীবনেও একই অবস্থা। সংসারে ঢুকে সে নানান সমস্যায় পড়ল। অল্প বেতন। অনেকগুলি ছেলে-পুলে। অভাব-অনটন। একেকবার সে দুঃখের গল্প করে, অমিরা হেসে গড়িয়ে পড়ি। একবার বিকেল বেলা মুখ শুকনো করে বলল, ঘরে আজ রান্না হয় নাই ভাই। একটা পয়সা ছিল না।

তার কথা শুনে হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরে যাবার মত অবস্থা। কি মজার ব্যাপার ঘরে পয়সা নেই।

শেষ করবার আগে এই প্রসঙ্গে একটা দামী উপদেশ দিতে চাচ্ছি। অল্প বয়েসী মেয়েদের সঙ্গে কখনো কোন রসিকতা করবেন না। যদি এদের কোন একটি রসিকতা পছন্দ হয়ে যায় তাহলে আপনার অবস্থা কাহিল। "ঐ গল্পটা আরেকবার বলেন না। ঐ গল্পটা আরেকবার বলেন না।"

শিরীন নামের এক মেয়েকে কোন এক কুক্ষণে নাসিরুদ্দিন হোজ্জার একটা গল্প বলেছিলাম। তারপর থেকে যেখানেই তার সঙ্গে দেখা হয় সে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে এবং বলে—ঐ গল্পটা আরেকবার বলেন। প্লীজ।

আমাকে বলতে হয়। তিন বছরের মধ্যে আমি হাজার খানিকবার এই গল্প বললাম। জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। নাসিরুদ্দিন হোজ্জাকে কাছে পেলে কাঁচা খেয়ে ফেলি এমন অবস্থা। সেই সময়কার কথা, নিতান্ত উপায়ন্তর না দেখেই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ব্লাডারের প্রেসার কমাচ্ছি, মনে মনে প্রার্থনা করছি যেন পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা না হয়। ঠিক তখন আমার পেছনে একটা রিক্সা থামল। আমার বুক ধক্ করে উঠল। শিরীনের আদুরে গলা, হুমায়ূন ভাই এখানে কি করছেন?

আমি মনে মনে বললাম, হারামজাদী দেখছিস না কি করছি? দ্রুত জীপার লাগাতে গিয়ে আরেকটা এ্যাকসিডেন্ট হল। জীপার দেয়া প্যান্ট যারা পরেন তাঁদের জীবনে এ জাতীয় দুর্ঘটনা একাধিকবার ঘটে। তবু ফ্যাকাসে হাসি হেসে বললাম, তারপর কি খবর? ভালতো?

শিরীন বলল, এ হচ্ছে আমার বান্ধবী লোপা, আপনি একে ঐ

গল্পটা বলেনতো। প্লিজ। না না বলতেই হবে। আমি কোন কথা শুনব না।

সেই থেকেই আমি কারো সঙ্গে রসিকতা করতে পারি না। কারো রসিকতা শুনে হাসতেও পারি না। রিটায়ার্ড এস পি, মজিদ সাহেবের মত নিজেকে প্রশ্ন করি—মানুষ হাসে কেন

পুনশ্চ : উন্মাদের পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে একটি রসিকতা। এই রসিকতা অনেকটা। Q টেস্টের মত। এটা শুনে যদি কেউ হাসে তাহলে বুঝতে হবে তার বুদ্ধি কম। যে যত শব্দ করে হাসবে সে তত বোকা। যদি না হাসে তা হলে বুদ্ধিমান। যদি বিরক্ত হয় তাহলে আতেল।

এক লোক কানে কম শুনে।

সে তার বেগুন ক্ষেতের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পথচারী এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ছেলেপুলে কি ?

লোকটি বলল, বৎসরে দুই একটা হয়। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে খাই।

কোথায় যেন পড়েছিলাম পাগলরা সবচে' ভাল উপদেশ দেয়। কথাটির তেমন গুরুত্ব দেইনি। কারণ উপদেশ দেয় এ জাতীয় পাগল আমার চোখে পড়েনি। বহুকাল আগে যখন ফুলবাড়িয়াতে রেল স্টেশন ছিল তখন একজনকে দেখেছিলাম। সে ট্রেনের ইঞ্জিনগুলিকে গম্ভীর গলায় উপদেশ দিচ্ছিল—"বাবারা লাইনে থাকিস।" নিঃসন্দেহে ভাল উপদেশ। তবে ইঞ্জিনগুলি এই উপদেশকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা বলা মুশকিল।

কিছুদিন আগে আমি কিন্তু এক পাগলের কাছ থেকে সত্যি সত্যি একটা ভাল উপদেশ পেলাম। এই পাগল হচ্ছেন আমার দূর সম্পর্কের মামা। ঝিকাতলায় থাকেন। অত্যন্ত ভালজাতের পাগল। হৈ চৈ নেই, গোলমাল নেই—মধুর স্বভাব। মুখে হাসি লেগেই আছে। কথা বার্তাও খুব স্বাভাবিক। তাঁর পাগলামির একমাত্র নমুনা হচ্ছে মামীকে দেখলেই শিশুদের মত এক বিঘৎ জিহ্বা বের করে ভেংচি দিতে থাকেন। যতক্ষণ মামী সামনে থাকেন ততক্ষণ এই অবস্থা। মামী প্রথম দিকে খুব কান্নাকাটি করতেন। দেয়ালে কপাল ঠুকতেন। এখন সহ্য করে নিয়েছেন। পারতপক্ষে সামনে আসেন না আর এলেও লম্বা ঘোমটা দিয়ে থাকেন।

এই মামার সঙ্গে এক সন্ধ্যাবেলায় আমার দেখা। তিনি বললেন—সেজেগুজে যাচ্ছিস কোথায়?

ঃ বিয়ে বাড়ীতে যাচ্ছি মামা। বৌ-ভাতের দাওয়াত।

মামা সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে একটি উপদেশ দিলেন। নীচু গলায় বললেন—খেতে বসার সময় গুণে গুণে তিন নম্বর চেয়ারে বসবি। শুরু থেকে এক দুই করে তিন নম্বরটায়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন ?

ঃ রেজালার বাটি সব সময় তিন নম্বর চেয়ারের সামনে পড়ে।

আমি সেদিন সত্যি সত্যি তিন নম্বর চেয়ারে বসেছিলাম এবং সামনে রেজালার বাটি পেয়েছি। এখনো তাই করি এবং হাতে হাতে ফল পাই। যে সব পাঠক-পাঠিকা আমার এলেবেলে পড়েন তাঁদেরকে বলছি, ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখুন।

আগের কথায় ফিরে যাই। মামার উপদেশ শোনার পর থেকে পাগলদের উপর আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা বেশ খানিকটা বেড়ে যায়। আমার ধারণা, এরা নিজের এবং চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে বেশ ভাল রকম চিন্তা-ভাবনা করে এবং এদের লজিকও বেশ পরিষ্কার। তারচেয়েও বড় কথা এদের রসবোধ আমাদের চেয়েও ভাল।

আমি এক রাজনৈতিক সভায় জনৈক পাগলের কাণ্ডকারখানা দেখে এদের রসবোধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হই। বেশ উষ্ণ বক্তৃতা হচ্ছিল। রোগামত এক নেতা গণতন্ত্রের কথা বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলেছেন তখন অঘটন ঘটল। এক পাগল উঠে দাঁড়াল এবং অবিকল ঐ নেতার মত হাত পা-নেড়ে বক্তৃতা শুরু করল। তার

বক্তৃতা আরো জ্বালাময়ী। আমরা সবাই নেতাকে বাদ দিয়ে তার কথা শুনছি এবং বিমলানন্দ ভোগ করছি। রোগা নেতা তীব্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন পাগলের দিকে। বুঝতে পারছি ভদ্রলোক যথেষ্ট অপ্রস্তুত বোধ করছেন। তিনি বেশ কয়েকবার হ্যালো হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিটিং ওয়ান, টু, থ্রি বলে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলেন—পারলেন না। কারণ ততক্ষণে পাগলের ভেতর জজবা এসে গিয়েছে সে অত্যন্ত উঁচু গলায়—"বস্ত্র সমস্যার সমাধান করিতে হইবে" বলে নিজের লুঙ্গী খুলে গামছার মত কাঁধে ফেলে দিয়ে হাসিমুখে তাকাচ্ছে সবার দিকে। আমরা তুমুল করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করলাম। রোগা নেতার ইশারায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে ঘাড় ধরে বের করে আবার সভার কাজ শুরু হল। কিন্তু সভা আগের মত আর জমল না। নেতা আবেগ কম্পিত গলায় যাই বলেন শ্রোতারা দাঁত বের করে হাসে। নেতা তার বক্তৃতায় ফর্মূলা মত যেই বস্ত্র সমস্যার কথায় এসেছেন ওম্নি লোকজন চেঁচাতে শুরু করল—পায়জামা খুইল্যা তারপরে কন। আগে পায়জামা খুইল্যা কান্দে ফেলেন। হে হে হে। হা হা হা। হো হো হো।

পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবতে পারেন নেতাদের ব্যঙ্গ করবার জন্যে উপরের ঘটনাটি আমি বানিয়েছি। এত সাহস আমার নেই। নেতাদের আমি বড় ভালবাসি। যে পাগলটির কথা বললাম সে ঢাকা শহরের একজন পুরানো পাগল। যে সব মেয়েরা ১৯৭২-৭৩ সনের দিকে রোকেয়া হলে থাকতেন তাঁরা এই পাগলকে ভাল করেই চেনেন। সেহ সময়ে এই পাগলকে প্রায়ই হলের গেটের কাছে দেখা যেত। লাজুক ধরনের মেয়েদের কাছে গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ী ভঙ্গিতে বলত—আপা একটা জিনিস দেখবেন? মেয়েটি হ্যাঁ-না কিছু বলার আগেই সে লুঙ্গী খুলে ফেলার একটা ভঙ্গি করত। মেয়েটি চিৎকার করে ছুটে যেত হল গেটের দিকে। পাগলা মজা পেয়ে মিটিমিটি হাসত। শুনেছি একবার নাকি একটি সাহসী মেয়ে বলেছিল—হ্যাঁ দেখব। এতে পাগলা খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ে। মখ কালো করে চলে যায়। এরপর থেকে এই অঞ্চলে তাকে আর তেমন দেখা যায়নি।

নাগরিক পাগলাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। সেই তুলনায় গ্রামের পাগলদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক থাকে। সবাই নিশ্চয়ই জানেন প্রতিটি গ্রামে একজন মহাবোকা এবং একজন পাগল থাকে। এদের দু'জনের কাজ হচ্ছে গ্রামবাসীদের

জন্যে নির্দোষ বিনোদন সরবরাহ করা। বিশেষ করে গ্রামে যখন বরযাত্রী আসে বা অতিথি আসে তখন পাগল এবং মহাবোকাকে সমাদরের সঙ্গে তাঁদের সামনে উপস্থিত করা হয়। যাতে অতিথিরা পাগলামি এবং বোকামি দেখে বিমলানন্দ উপভোগ করতে পারেন।

আমাদের গ্রামে যে পাগল ছিল তার নাম নশু পাগল। তার পাগলামির লক্ষণ হচ্ছে সে একটা লম্বা লাঠি মাটিতে রেখে বলবে—তিন হাত পানি। সারাক্ষণই সে বিভিন্ন জায়গায় লাঠি রেখে পানি মাপছে। কখনো তিন হাত কখনো পাঁচ হাত। যাই হোক, একবার বরযাত্রী এসেছে সবাই ধরে নিয়ে এল নশুকে। তাকে জিজ্ঞেস করা হল—পানি কতটুকুরে নশু? লাঠি দিয়ে মেপে বল দেখি।

নশু অবাক হয়ে বলল, শুকনা খট খট করতাছে। পানির কথা কি কন?

সবাই রেগে আগুন। কড়া গলায় বলল, লাঠি দিয়ে মেপে ঠিকমত বল হারামজাদা তিন হাত পানি না পাঁচ হাত পানি।

নশু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল---পানিতো দেখি না। এইসব কি কন? পাগলের কথাবার্তা।

নশুকে ধরে শক্ত মার দেয়া হল। গ্রামের বেইজ্জতী হয়ে যাচ্ছে সহ্য করা মুশকিল। মার খেয়ে নশুর বুদ্ধি খুলল। লাঠি মাটিতে ধরে বলল, সাড়ে চাইর হাত পানি।

সবার মুখে হাসি ফিরে এল। বরযাত্রীদের একজন বলল--পানি বাড়ছে না কমছে?

ঃ বাড়তাছে। এখন হইছে পাঁচ হাত।

গ্রামে শান্তি ফিরে এল। আধঘন্টা ধরে নশু বরযাত্রীর সামনে বিভিন্ন জায়গায় লাঠি রেখে পানির উচ্চতা বলতে লাগল। বরযাত্রীরা মহাখুশী।

আমার মনে হয় শুধু গ্রামে নয় সমাজের প্রতিটি স্তরে একজন করে পাগল দরকার। লেখক এবং কবিদের মধ্যেও দরকার একজন পাগলা-লেখক কিংবা পাগলা কবি। ঠিক তেমনি পত্র-পত্রিকার মধ্যে একটি পাগলা পত্রিকা দরকার যেমন 'উন্মাদ'।

পুনশ্চ ঃ পাগলদের নিয়ে আমি কয়েকদিন আগে একটা চমৎকার রসিকতা পড়লাম। আপনাদের কেমন লাগবে বুঝতে পারছি না তবু বলছি। মিঃ জোনসের ইনসমনিয়া হয়েছে। পর পর চার রাত অঘুমো থেকে অবস্থা কাহিল। নানান ধরনের সিডেটিভ দিয়েও কাজ হল না

তখন মিঃ জোনেসের আত্মীয়-স্বজন একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে আনলেন। সাইকিয়াট্রিস্ট বললেন, রুগীকে হিপনোটাইজ করে ঘুম পাড়িয়ে দেব। এই বলে তিনি রুগীর সামনে হাত নাড়তে নাড়তে বললেন—ঘুম আসছে, আপনার চোখে নেমে আসছে ঘুম। বাইরের জগৎ সংসার আপনার কাছে বিলুপ্ত। আপনার চোখে তন্দ্রা। এইত চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। নিঃশ্বাস হচ্ছে ভারী।

সত্যি সত্যি জোনসের চোখ বন্ধ হয়ে এল। নিঃশ্বাস হল ভারী। ডাক্তার ভিজিট নিয়ে দরজার বাইরে যেতেই মিঃ জোনেস চোখ-মেলে ভয়ার্ত গলায় বললেন—পাগল বিদেয় হয়েছে?

আমাদের পাড়ায় 'সাহিত্য বাসর' নামে চেংড়া ছেলেপুলেদের কি যেন একটা আছে। এদের কাজ হচ্ছে দু'দিন পর পর মাইক লাগিয়ে পাড়ায় সবাইকে বিরক্ত করা। গল্প পাঠের আসর, কবিতা সন্ধ্যা, ছড়া বিকেল, বৃন্দ আবৃত্তি একটা না একটা লেগেই আছে। এসব ঝামেলা ঘরে বসে সেরে ফেললেই হয় তা করবে না। প্যাণ্ডেল খাটাবে, মাইক ফিট করবে—বিরাট জলসা। পয়সা কোত্থেকে পায় কে জানে। দেশ যখন বন্যার পানিতে ডুবে গেল তখন 'সাহিত্য বাসরে' অনুষ্ঠানের ধুম পড়ে গেল। বন্যার্তদের সাহায্যার্থে কমিক অনুষ্ঠান, বিচিত্রা অনুষ্ঠান, আনন্দ মেলা। এই পর্যায়ের শেষ অনুষ্ঠানটি হল 'আপনার কি আছে?' আগে ব্যাপারটি সম্পর্কে আপনাদের একটু বলে নেই, তারপর মূল ঘটনায় যাব।

ছুটির দিন সকাল বেলায় আরাম করে দ্বিতীয় কাপ চায়ে চুমুক দিচ্ছি সাহিত্য বাসরের দল বল উপস্থিত। সবার মুখেই হাসি। হাসি দেখেই আঁতকে উঠতে হয়। কারণ এরা সহজে হাসে না। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম কি ব্যাপার?

ঃ আমরা মারাত্মক একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি স্যার। নাম হচ্ছে 'আপনার কি আছে?' বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য।

ঃ বাহ্ খুব ভাল।

ঃ একটা ইউনিক আইডিয়া। গান-বাজনা কিচ্ছু না। ফাকা স্টেজ। স্টেজের মাঝখানে একজন ভিখারী বসে থাকবে গায়ে কোন কাপড় নেই। শুধু কলাপাতা দিয়ে লজ্জাটা ঢাকা। তখন ব্যাকগ্রাউণ্ডে মাইকে বলা হবে—। 'আপনার অনেক আছে, এর কিছুই নেই। একে কিছু

দিন।' তখন দর্শকদের মাঝখান থেকে একজন উঠে আসবে। সে তার মানিব্যাগ শার্ট-গেঞ্জী এসব খুলে দেবে। প্রচণ্ড হাততালি। ব্যাকগ্রাউণ্ডে মিউজিক—'ঐ মহামানব আসে।' আইডিয়া কেমন স্যার?

ঃ খুব ভাল, তোমাদের ধারণা লোকজন সব স্টেজে এসে সব খুলে দিয়ে চলে যাবে?

ঃ শুরুতে যাবে না তবে প্রথম কয়েকজন যখন সাহস করে যাবে তখন ফ্লো এসে যাবে। আপনিতো জানেন স্যার বাঙ্গালী হচ্ছে হুজুগে জাতি। ফ্লোর উপর চলে।

ঃ তা ঠিক।

ঃ এখন আপনি হচ্ছেন আমাদের ভরসা।

আমি মনের উদ্বেগ বহুকষ্টে চাপা দিয়ে বললাম—আমি ভরসা মানে?

ঃ প্রথম যে মানুষটি যাবে সে হচ্ছে আপনি। এ পাড়ায় আপনার একটা ইজ্জত আছে। প্রফেসর মানুষ, প্রথম আপনি গেলে অন্য রকম এফেক্ট হবে। একটু হাইড্রোমা, স্যার করতেই হবে উপায় নেই।

ঃ কি রকম হাইড্রোমা?

ঃ সব কাপড়-চোপর আপনাকে খুলে ফেলতে হবে। তারপর আমরা আপনাকে ঠিক ভিখিরীর মত একটা কলাপাতা দিয়ে জড়িয়ে দেব। আপনি কিন্তু না বলতে পারবেন না। রিকোয়েস্ট।

উন্মাদের পাঠক-পাঠিকা আমি কি করে সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম সেই দীর্ঘ কাহিনী বলতে চাই না তবে অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত কি রকম হল সেটা বলছি।

অনুষ্ঠান শুরু হল সন্ধ্যায়। প্রধান অতিথি চলে এলেন। তার নাম বলছি না। কারণ ইনি একজন পেশাদার প্রধান অতিথি। সবাই একে চেনেন। ঢাকা শহরের শতকরা আশি ভাগ অনুষ্ঠানে তিনি হয় প্রধান অতিথি, কিংবা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। চমৎকার একটি বক্তৃতা দেন। যে ফুলের মালাটি তাকে দেয়া হয় সেটি তিনি একটি শিশুর গলায় পরিয়ে অত্যন্ত নাটকীয় কায়দায় শিশুটির কপালে চুমু খান। তখন বিক্ষিপ্তভাবে হাততালি পড়ে। যাই হোক এই প্রধান অতিথি ভদ্রলোক সম্ভবতঃ অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগে কিছু জানতেন না। যখন দেখলেন স্টেজে কলাপাতা গায়ে এক নেংটো ভিখারী বসে আছে তখন স্বভাবতঃই ঘাবড়ে গেলেন।

তারপর যখন মাইকে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বলা হল তখন প্রধান

অতিথি শুকনো গলায় বললেন, এ সব এরা কি বলছে? হোয়াট ডু দে মিন?

আমি তাঁকে সাহস দেবার চেষ্টা করলাম কিন্তু ততক্ষণে মাইকে উদাত্ত গলায় বলা হচ্ছে—এবার আমাদের এই অনুষ্ঠানে প্রথম যিনি তার সর্বস্ব দিয়ে এক অনুপম আদর্শের সূচনা করবেন তিনি হচ্ছেন আমাদের অতি আদরের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সাহিত্য বোদ্ধা, অনল-বর্ষী বক্তা, সমাজের বন্ধু, অভাজনের চোখের মণি—প্রধান অতিথি কাঁপা গলায় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন দৌড়ে পালিয়ে যাবার কোন উপায় বোধ হয় নেই। আমি কোন উত্তর দিলাম না। সাহিত্য বাসরের কর্মীরা কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে ঠেলাঠেলি করে স্টেজে উঠিয়ে দিল। ব্যাকগ্রাউণ্ডে গান হতে লাগল 'ঐ মহামানব...ও...আসে।' যেরকম আশা করা হয়েছিল সে রকম হ'ল না। বাঙালী হুজুগে জাতি হলেও এই হুজুগে তারা মাতালো না, দ্রুত মাঠ খালি হয়ে গেল। শুধু প্রধান অতিথি একটি কলাপাতায় লজ্জা নিবারণ করে ত্রিভঙ্গ মুরারী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন গলায় ফুলের মালা, সামনে পিরিচে ঢাকা পানির গ্লাস নিয়ে যিনি শান্ত সমাহিত ভঙ্গিতে বসে থাকেন তাঁকে অনেক সমস্যার মুখামুখি হতে হয়। অন্য শ্রোতাদের মত তিনি ঘুমিয়ে পড়তে পারেন না। অসুবিধা জায়গায় চুল-কানি শুরু হলে চুলকাতে পারেন না। হাসি মুখে বসে থাকতে হয় এবং ভান করতে হয় বিমলানন্দ উপভোগ করছেন। প্রফেশন্যালরা এই কাজটা ভালই করেন। অসুবিধা হয় যাঁরা প্রফেশন্যাল না তাঁদের। আমার নিজের দেখা একটা দৃশ্য বলছি। "বাংলাদেশ পুষ্পপ্রেমী"দের একটি অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি হচ্ছেন হাজী আসমত আলি বেপারী। ইনি কিছুদিন হল শুকনো মরিচের ব্যবসা করে প্রচুর পয়সা করেছেন। তাঁকে প্রধান অতিথি করার একটিই উদ্দেশ্য কিছু পয়সা-কড়ি পাওয়া।

হাজী আসমত আলি বেপারী চোখ বড় বড় করে দু'ঘন্টার মত সময় মূর্তির মত কাটালেন। তারপরই সম্ভব-অসম্ভব জায়গায় চুলকাতে শুরু করলেন এবং বিকট মুখভঙ্গি করতে লাগলেন। উদ্যো-ক্তারা বিপদ দেখে চট করে সভা সমাপ্ত করলেন। প্রধান অতিথিকে বক্তৃতা দেবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হল এবং কানে কানে বলা হল ফুলের উপর দু'একটা কথা বলবেন। বেশী কিছু বলার দরকার নেই।

হাজী সাহেব শুরু করলেন গোলাপ দিয়ে। গোলাপের বর্ণ গন্ধ এইসব নিয়ে প্রচুর উচ্ছাস করে বললেন—গোলাপ হচ্ছে আমাদের জাতীয় ফুল।

তাঁকে কানে কানে বলা হল গোলাপ নয়, জাতীয় ফুল হচ্ছে শাপলা। তিনি হুংকার দিয়ে বললেন, কোন্ শালায় বলে শাপলা জাতীয় ফুল? কোথায় গোলাপ আর কোথায় শাপলা? কোথায় আইয়ুব খান আর কোথায় খিলি পান! ভাইসব আপনারা বলেন—শাপলা-কি একটা ফুল? শাপলা হচ্ছে একটা তরকারি।

বুঝতেই পারছেন প্রফেশনাল নন এসব লোকদের প্রধান অতিথি করা খুব রিস্কি ব্যাপার। আবার প্রফেশনালদের নিয়েও কিছু সমস্যা আছে। এরা এই কাজ করতে করতে একটু বেশী রকম আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েন। যা নাকি মাঝে মাঝে জটিলতার সৃষ্টি করে। আমি এরকম একজনকে চিনি। তিনি সভাতে এসেই খোঁজ নেন সভা কতক্ষণ চলবে। সময়টা জেনে নিয়ে চট করে ঘুমিয়ে পড়েন। দর্শকরা কেউ তা বুঝতে পারে না। সবাই ভাবে চোখ বন্ধ করে গভীর মনোযোগে তিনি

শুনছেন। অনুষ্ঠান শেষ হবার আধঘন্টা আগে জেগে উঠেন এবং যথাসময়ে একটি চমৎকার বক্তৃতা দেন। একবার গণ্ডগোল হয়ে গেল। উদ্যোক্তারা বলছে অনুষ্ঠান তিন ঘন্টার মত চলবে। সেই হিসাবে তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হলেন। কিন্তু অনুষ্ঠান দু'ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল। তাঁকে জাগান হল। তাঁর ভাবভঙ্গি দিশাহারার মত। যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। ধরাধরি করে মাইকের সামনে নেয়া হল। তিনি কিছুই বলছেন না। একজন কানে কানে বলল, স্যার কিছু বলুন। তিনি হুংকার দিলেন, কেন?

ঃ আপনি স্যার প্রধান অতিথি।

তিনি এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। দর্শকদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠল এবং এক সময় সবাইকে হতভম্ব করে তিনি বললেন, 'ঝুথির মা আমাকে আধাকাপ চা দাও।'

প্রধান অতিথি প্রসঙ্গে আমার নিজের একটি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা আছে। বেশ অনেকদিন আগের কথা। একদল ছেলে এসে আমাকে ধরল প্রধান অতিথি হতে হবে। আমি এক কথায় রাজি। ওদের বলে দিলাম নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে আমি উপস্থিত থাকব। চারটার সময় যাবার কথা। আমি অবশ্যি চারটার সময় গেলাম না। প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি এদের একটু দেরীতে উপস্থিত হতে হয় এটাই নিয়ম। আমি কুড়ি মিনিটের মত দেরী করলাম। অনুষ্ঠান তখন শুরু হয়নি। কিন্তু কি সর্বনাশ! ডায়াসে প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি দু'জনই উপস্থিত। একি কাণ্ড। আমি কি করবো ভাবছি। উদ্যোক্তাদের একজন এগিয়ে এসে নীচু গলায় বলল, আপনি হচ্ছেন স্যার স্ট্যাণ্ডবাই প্রধান অতিথি। আসল জন না এলে আপনাকে বসিয়ে দিতাম।

ঃ বল কি তুমি?

ঃ কি করব স্যার বলেন, কেউ কথা রাখে না। বলে আসবে কিন্তু আসে না। এই জন্য স্ট্যাণ্ডবাই রাখতে হয়। আসেন স্যার এক কাপ চা খান। চা না খেলে বুঝব আপনি রাগ করেছেন।

গেলাম চায়ের দোকানে। সেখানে আরেকজন স্ট্যাণ্ডবাই বিশেষ অতিথি বিমর্ষ মুখে বসে আছেন। আমাকে দেখে মুখ কালো করে বললেন, আমি একা এলে একটা কথা হত। স্ত্রী এবং ছোট শালীকে নিয়ে এসেছি, এদের কাছে কি বলি? আপনি বলুনতো ভাই?

আমি উনাকে কি বলব। আমি নিজেও আমার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছি। জীবনের প্রথম প্রধান অতিথি আর স্ত্রী সেটা দেখবে না, তা কি হয়?

এবারের এলেবেলে ডাক্তারদের নিয়ে। কাজেই ভয়ে ভয়ে লিখছি। ডাক্তাররা রাজনীতিবিদদের মতই সেনসেটিভ। কেউ হা করলেই মনে করে গাল দিচ্ছে। রসিকতা একেবারেই ধরতে পারে না। রসিকতার কারণেই আমার দীর্ঘ দিনের ডেনটিস্ট বন্ধু এ. করিমের সঙ্গে আমার কথাবার্তা বন্ধ। এক সন্ধ্যাবেলা তার চেম্বারে দাঁত দেখাতে গিয়ে ডেনটিস্টদের নিয়ে একটা গল্প বললাম। এই গল্পই হল আমার কাল। বন্ধু রেগে অস্থির। গল্পটা এরকম।

"এক দাঁতের ডাক্তার খুব সহজেই একটা দাঁত টেনে তুললেন। এত সহজে দাঁত উঠে আসবে তিনি ভাবেন নি। রুগীকে বললেন—ব্যথা পেয়েছেন? রুগী বলল, জ্বি না স্যার।

ঃ দাঁত তোলার ব্যাপারটা কত সহজ দেখলেনতো? শুধু শুধু আপনারা ভয় পান।

রুগী টাকা-পয়সা দিয়ে চলে গেল। ডাক্তার চিমটা খুলে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন—দাঁত নয় তিনি হ্যাচকা টানে রুগীর আলজীব তুলে নিয়ে এসেছেন!"

উন্মাদের পাঠকমাত্রই বুঝতে পারছেন অতি নির্দোষ গল্প। কিন্তু আমার বন্ধু এ. করিম সেটা বুঝল না। চোখ-মুখ লাল করে বলল এটা একটা কথা হল? কোথায় আলজীবের পজিশন আর কোথায় দাঁতের পজিশন। তাছাড়া আলজীব টেনে তুললেওতো ব্যথা লাগবে। সেখানেতো আর লোকাল এ্যানেসথোসিয়া করা হয়নি।

আমি বললাম, তুই এত রেগে যাচ্ছিস কেন এটা একটা গল্প। একটা রসিকতা!

ঃ রসিকতা মানে? রসিকতার কোন মা-বাপ থাকবে না? যা ব্যাটা তোর দাঁত আমি তুলব না।

আমি দাঁতের ব্যথায় কোঁ কোঁ করতে করতে ঘরে ফিরলাম এবং প্রতিজ্ঞা করলাম এই জীবনে দাঁতের ডাক্তারদের নিয়ে কোন রস করবার চেষ্টা করব না। রস করা মানেই হাসানো। হাসানো মানেই দাঁত বের করা। ডেনটিস্টরা এই দাঁত জিনিসটাই সহ্য করতে পারেন না। দাঁত দেখামাত্রই তাদের টেনে তুলে ফেলতে ইচ্ছা করে। সেই তোলা ব্যাপারটাও তাঁরা এক দফায় করেন না। প্রথম দফায় দাঁত ক্লিনিং। দ্বিতীয় দফায় টেম্পোরারী ফিলিং। তৃতীয় দফায় পার্মানেন্ট ফিলিং। চতুর্থ দফায় দন্ত উৎপাটন। পঞ্চম দফায় পাশের দাঁতে টেম্পোরারী ফলিং.....

পুনঃপৌনিক অংকের মত ব্যাপার। চলতেই থাকবে যতদিন না মুখ দন্তশূন্য হয়।

বছরখানিক আগে আমার ছোট চাচীকে নিয়ে গিয়েছি এক ডেনটিস্টের কাছে। চাচী নকল দাঁত নেবেন। ডাক্তার পরীক্ষা-টরীক্ষা করে বলল, সাতটা দাঁত আপনার ভাল। এদের তুলে ফেলে দিলে নকল দাঁত বসানোর খুব সুবিধা হবে। চাচী রাজি নন। হারাধনের সাত সন্তান ধরে রাখতে চান। ডেনটিস্টও ছাড়বে না সে তুলবেই। হেনতেন কত কথা। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার বললেন,

ঃ আপনি মুরুব্বী মানুষ। আপনাকে হাফ-ফীতে তুলে দেব!

এতে কাজ হল। অর্ধেক দামে হয়ে যাচ্ছে এই লোভ সামলানো মুশকিল। চাচী তাঁর সাতখান দাঁত রেখে ফোকলা মুখে ঘরে ফিরলেন।

থাক ডেনটিস্টের কথা। রেগুলার ডাক্তারদের কথা কিছু বলি। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু করি। একবার এক স্কীন স্পেশালিস্টের কাছে যেতে হল। গিয়ে দেখি হলুস্থুল ব্যাপার—ইস্কুল খুইলাছেরে মওলা ইস্কুল খুইলাছে। গোটা পঞ্চাশেক রুগী বসে আছে। আমার নম্বর হল একান্ন। বসে আছি তো বসেই আছি। একটু লজ্জা লজ্জাও লাগছে। কারণ ডাক্তারের বিশাল সাইন বোর্ডে লেখা—চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ। আমার কেবলি মনে হচ্ছে সবাই বোধ হয় আমাকে শেষের রোগের রুগী বলেই ভাবছে।

আপনারা সবাই জানেন স্পেশালিস্টের কাছে কেউ একা যায় না। এমন একজনকে নিয়ে যায় যে স্পেশালিস্ট বিশেষজ্ঞ। অর্থাৎ ঢাকা শহরে

কোথায় কোন স্পেশালিস্ট আছে তা এরা জানেন। কে ভাল কে মন্দ কার কি স্বভাব এসব তাঁদের নখদর্পণে। আমি যাকে সঙ্গে নিয়ে গেছি তিনি সম্পর্কে আমার মামা। অত্যন্ত করিৎকর্মা ব্যক্তি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুরে এসে বললেন, দশ টাকা ঘুষ দিলেই কার্যোদ্ধার হবে। আমি চমকে উঠে বললাম, কাকে ঘুষ দেব ডাক্তারকে?

ঃ আরে না। তার এ্যাসিসটেন্টকে। দশটা টাকা খাওয়ালেই সে তোর একান্ন নম্বর টিকিটকে পনেরো বানিয়ে দেবে। যা তুই দশটা টাকা দিয়ে আয়। আমি মুরুব্বী মানুষ আমার দেয়া ঠিক হবে না।

ঘুষ কি করে দিতে হয় সেই কায়দা জানা না থাকায় দেয়া গেল না। ঘুষ নিশ্চয়ই প্রকাশ্যে দেবার বিধান নেই। কিন্তু যে টাকা নেবে সে বহুলোকের মাঝখানে বসে আছে। গোপনে তাকে টাকা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জুয়েল আইচ সাহেব পারলেও পারতে পারেন।

যাই হোক এক সময় ডাক্তারের সামনে উপস্থিত হতে পারলাম। রোগের লক্ষণ বলা শুরু করবার আগেই ডাক্তার ইশারায় আমাকে থামিয়ে দিলেন। হাতের চামড়ায় যে সাদা দাগের চিকিৎসার জন্যে এসেছি সেটা দেখাতে গেলাম তার আগেই দেখি প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ। আমি বললাম, আমার অসুখটা কি? ডাক্তার সাহেব ভারী গলায় বললেন—একশ।

প্রথমে ভাবলাম এটাই বুঝি অসুখের নাম। আমার মামা পেটে খোঁচা দিয়ে বললেন—একশ' টাকা দিতে বলছে।

দিলাম একশ' টাকা। ডাক্তার একটি চিমটা দিয়ে টাকা নিলেন। হাত দিয়ে ছুলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন—টাকায় অনেক ময়লা থাকেতো—নানান রকম মাইক্রঅরগেনিজম এইজন্যে হাত দিয়ে ছুঁই না। আপনি আবার অন্য কিছু ভাববেন না।

বেরিয়ে এসে মামাকে বললাম—ব্যাটাতো কিছু দেখলই না। এর ওষুধে কাজ হবে? মামা বিরক্ত হয়ে বললেন, কাজ না হলে শ' খানেক লোক বসে থাকে? গাধার মত কথা বলিসনাতো।

রোগ সম্পর্কে কিছু না জেনেও যে রোগের চিকিৎসা বেশ ভাল-ভাবেই করা যায় এটা বোধ সত্যি। আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কথা বলি। আমার রুমমেট জ্বর-ডাইরিয়া এবং মাথা ব্যথায় কাতর। ইউনিভার্সিটির ডাক্তারকে খবর দেয়া হল। ডাক্তার এলেন। রুমমেট তখন বাথরুমে (সেই সময় এটাই তার স্থায়ী ঠিকানা)। ডাক্তার

সাহেব আমাকেই রুগী ভাবলেন। হা করতে বললেন। ঠিকই হা করলাম। পেটে দু'তিনটা খোঁচা দিয়ে প্রেসক্রিপশন লিখে ফেললেন। আমি তাঁর ভুল ভাঙ্গালাম না। কি দরকার ভদ্রলোককে লজ্জা দিয়ে। অদ্ভুত কাণ্ড সেই প্রেসক্রিপশন মোতাবেক ওষুধ খেয়ে আমার রুমমেট ভাল হয়ে গেল। ডাক্তারী শাস্ত্রটার প্রতি সেই থেকেই আমার খুব ভক্তি শ্রদ্ধা। বড়ই রহস্যময় শাস্ত্র।

শুধু চিকিৎসা নয় চিকিৎসা সংক্রান্ত সব ব্যাপারই আমার কাছে খুব রহস্যময় মনে হয়। আমার বড় মেয়েটির জণ্ডিসের মত হয়েছে ডাক্তার বললেন, বিলরুবিন টেস্ট করানো দরকার। এক জায়গায় না করিয়ে দু'জায়গায় করাবেন। করলাম দু'জায়গায়। এক জায়গার বলল, জণ্ডিস নেই, অন্য জায়গায় বিলরুবিন নাইন পয়েন্ট ফাইভ। যার মানে রোগের কঠিন অবস্থা। ডাক্তার বললেন, থার্ড এক পার্টিকে দিন। দেখি ওরা কি বলে?

আমি থার্ড পার্টিকে দিলাম না। কি দরকার? জণ্ডিসের এক মালা এনে গলায় পরিয়ে দিলাম—এই মালা গা বেয়ে নামলেই রোগ

সেরে যাবে বলে জনশ্রুতি। দেশের যে অবস্থা তাতে মনে হয় মালা, চাল পড়া, পানি পড়া এইসব আধ্যাত্মিক ওষুধ খুব খারাপ না।

ডাক্তার প্রসঙ্গে চীন দেশীয় একটি গল্প শুনুন। জনৈক চীনের তরুণকে বলা হল—তোমাদের এখানে খুব ভাল ডাক্তার কেউ আছেন? চীনাম্যান হাসি মুখে বললেন—হ্যাঁ আছেন। তাঁর নাম ইং চুন।

ঃ খুব ভাল ডাক্তার?

ঃ জ্বি হ্যাঁ। উনি একবার আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছেন।

ঃ কি রকম বল দেখি।

ঃ আমার একবার খুব অসুখ হয়। তখন আমি যাই ডাক্তার 'লী মাইয়ের কাছে। তিনি আমাকে কি কি সব ওষুধ দেন। সে সব খেয়ে আমি প্রায় মরমর। তখন গেলাম অন্য ডাক্তারের কাছে। তার ওষুধ খেয়ে অবস্থা আরো খারাপ। শেষ পর্যন্ত গেলাম ইং চুন-এর কাছে।

ঃ তিনি তোমাকে নতুন ওষুধ দেন?

ঃ জ্বি না। ডাক্তার ইং চুন তখন দেশে ছিলেন না। কাজেই ওষুধ দিতে পারেননি। এই কারণেই আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি। কাজেই আমি ইং চুনকে খুব বড় ডাক্তার বলি।

বানানো গল্প বাদ দিয়ে একটি সত্যি গল্প বলি। খোদ আমেরিকার হাসপাতালের ডাক্তাররা একবার দীর্ঘ সময়ের জন্যে স্ট্রাইক করেছিল। হাসপাতাল অচল। রুগীর চিকিৎসা হয় না। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, হিসেব করে দেখা গেল স্বাভাবিক অবস্থায় যত রুগী মারা যায়। স্ট্রাইক চলাকালীন অবস্থায় রুগী মারা গেছে অনেক কম। যার মোদ্দা কথা হচ্ছে খোদ আমেরিকাতে চিকিৎসা করেই রুগী বেশী মরে। না করলে মরত না।

এলেবেলে শেষ করবার আগে আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাটা বলে নেই। ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর ইউরিন ডাক্তারের কাছে দিয়ে এসেছেন প্রেগনেন্সি টেস্ট করানোর জন্যে। ডাক্তার টেস্ট করে বললেন, পজিটিভ রিজাল্ট। কনগ্রাচুলেশন্স আপনার স্ত্রী গর্ভবতী।

আমার বন্ধু ডাক্তারকে এই মারেতো সেই মারে। কারণ সে বোতলে করে টিউবওয়েলের পানি নিয়ে গিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য এই ক্লিনিকের

টেস্টগুলি কেমন তা আগেভাগে যাচাই করে নেয়া। আমার বন্ধু রাগে তোতলাতে তোতলাতে বলল, "আপনি বলতে চান আমার টিউবওয়েল গর্ভবতী?"

ডাক্তার দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেন, "হ্যাঁ তাই। আমাদের টেস্ট মিথ্যা হতে পারে না। তবে ঐ জিনিস কি করে গর্ভবতী হল তা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমি বলতে পারব না।"

পত্র-পত্রিকা খুললেই আজকাল ইন্টারভ্যু নামক একটি ব্যাপার চোখে পড়ে। চিত্রজগতের লোকজনদের সেখানে প্রাধান্য থাকলেও আজকাল ফাঁকে ফোকরে কিছু কবি, নাট্যকার, গল্প লেখক, চিত্রকর ঢুকে পড়ছেন। ইন্টারভ্যুগুলি সাধারণতঃ দু'ধরনের হয় (১) সহজিয়া ইন্টারভ্যু— আপনি কোন্ রাশির জাতক? আপনার প্রিয় রং কি? আপনার প্রিয় খাবার কি? আপনার হবি কি? আপনি মোহামেডানের সাপোর্টার না আবাহনীর? দ্বিতীয় ধরনের ইন্টারভ্যু হচ্ছে (২) কঠিনিয়া (বাংলা ব্যাকরণের ত্রুটি হলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি) ইন্টারভ্যু। এখানে প্রশ্নকর্তা বেকায়দা অবস্থা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেন। বেছে বেছে এমন সব প্রশ্ন করেন যার উত্তর উত্তরদাতার জানার কোনই কারণ নেই। উদাহরণ দিচ্ছি—মনে করা যাক একজন অভিনেত্রীর সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে। যিনি পড়াশোনার তেমন সুযোগ পাননি। ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠে সিনেমায় জড়িয়ে পড়েছেন। প্রশ্নকর্তা তাকে বেকায়দায় ফেলতে চান। সেটা তিনি সাধারণতঃ এ এভাবে করেন—

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা আপা, আপনিতো সাধারণ মানুষ সম্পর্কে ভাবেন তাই না?

উত্তর ঃ (খুবই অবাক) ওমা ভাববো না? আপনি আমাকে কি মনে করেন বাড়ি-গাড়ি করেছি বলেই ওদের কথা ভুলে গেছি? ছিঃ দুঃখী মানুষদের কথা মনে হলেই আমার..... (এইখানে তাঁর গলা প্রায় ধরে গেছে। কথা আটকে যাচ্ছে)

প্রশ্ন ঃ সমাজ পরিবর্তনের কথা আপনি নিশ্চয়ই ভাবেন?

উত্তর ঃ হুঁ খুব ভাবি।

প্রশ্ন ঃ অবসর সময়ে নিশ্চয়ই এই সমস্যা নিয়ে পড়াশোনাও করেন ?

উত্তর ঃ তা করি। পড়াশোনা করতে আমার ভীষণ ভাল লাগে।

প্রশ্ন ঃ দ্য ক্যাপিটাল বইটাতো আপনার নিশ্চয়ই পড়া। তাই না আপা ?

উত্তর ঃ হুঁ পড়েছি। খুব ভাল বই।

প্রশ্ন ঃ বইটির লেখকের নাম বলতে পারবেন ?

উত্তর ঃ (একটু সময় নিচ্ছেন) আমার আবার ভাই লেখকের নাম মনে থাকে না। বইয়ের ঘটনা মনে থাকে। লেখকের নামটাতো বড় নয়। বইটাই বড় তাই না ভাই ?

প্রশ্ন ঃ তাতো নিশ্চয়ই। ক্যাপিটাল বইটির ঘটনা মনে আছে আপনার ?

উত্তর ঃ অনেকদিন আগে পড়েছিতো পুরোপুরি মনে নেই। তবে বইটা খুব দুঃখের। লাস্ট সিনে মেয়েটা বোধ হয় মারা যায় তাই না ?

এখানে যা লক্ষণীয় তা হচ্ছে প্রশ্নকর্তা ফাঁদে ফেলবার জন্যে কি ভাবে এগুচ্ছেন। এবং উত্তরদাতা কত সহজে ফাঁদে পা দিচ্ছেন। সিনেমার নায়িকা নিয়ে উদাহরণ না দিয়ে আমি একটি বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছি। এবারের উত্তরদাতা একজন রাজনীতিবিদ। শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে এরা চিন্তা-ভাবনা এবং পড়াশোনা করেন বলে অনেকেই মনে করেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল তাঁর প্রিয় ঔপন্যাসিক কে ? তিনি একটি নাম বললেন। নামটি কার তা বলছি না তবে বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছেন। যারা পারছেন না তারা সম্ভবতঃ আমার কোন বই পড়েননি। হা হা হা।

যাই হোক নামটি বলেই তিনি কিন্তু ফাঁদে পা দিলেন।

প্রশ্ন ঃ তার কি কি বই পড়েছেন ?

উত্তর ঃ অনেকগুলি পড়েছি। নাম মনে করতে পারছি না।

প্রশ্ন ঃ কোন একটি উপন্যাসের ঘটনা যদি বলেন তা হলে নামটি মনে করবার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি। কোন ঘটনা মনে আছে ?

উত্তর ঃ জ্বি না।

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রিয় ঔপন্যাসিক অথচ আপনি তাঁর কোন বইয়ের নাম জানেন না। ঘটনা বলতে পারছেন না ব্যাপারটা কি ?

রাজনীতিবিদ নিরুত্তর। ইন্টারভ্যুটি ছাপা হয়েছিল বিচিত্রা কিংবা আনন্দ বিচিত্রায় আমার ঠিক মনে পড়ছে না। আমাদের সবচে' বড়

দুর্বলতা হচ্ছে আমরা কোন জিনিস সম্পর্কে অজ্ঞ ঐটি স্বীকার করতে চাই না। প্রশ্নকর্তা আমাদের এই দুর্বলতাকে চমৎকার ব্যবহার করেন। সুন্দর ফাঁদ পাতেন। অজান্তে সেই ফাঁদে পা দেই তারপর আর বেরুবার পথ থাকে না।

অবশ্যি ঠিকঠাক উত্তর দিয়েও অনেক সময় পার পাওয়া যায় না। প্রশ্নকর্তা উত্তরগুলি নিজের মত করে সাজান। উত্তর যেমন আছে তেমনি রাখেন কিছুই বদলান না কিন্তু সাজানোর কারণে সম্পূর্ণ উল্টে যায়। উদাহরণ দেই। মনে করা যাক, একজন সাংবাদিক নামী এক চিত্র তারকার ইন্টারভ্যু নিতে গেছেন। এ্যপয়েন্টমেন্ট ছিল ছ'টায় নায়িকা এলেন রাত ন'টায়। এসেই আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নানান জায়গায় টেলিফোন করতে লাগলেন। এক ফাঁকে শুধু বললেন, কিছু মনে করবেন না খুব ব্যস্ত। আপনাকে কিছু খেতে দিয়েছে? দেয়নি? ওমা কি কাণ্ড! কি খাবেন?

সাংবাদিক মহা বিরক্ত হয়ে বললেন, এক গ্লাস পানি খাব।

নায়িকা এক গ্লাস পানি টেবিলে রেখে উধাও হয়ে গেলেন। এখন সাংবাদিক ভদ্রলোক রিপোর্ট কি কি ভাবে লিখবেন? দু'ভাবে লিখতে পারেন।

নমুনা—১

[ভাল রিপোর্ট।]

মিস 'অ'র সঙ্গে আমার দেখা করার কথা সন্ধ্যা ছ'টায়। আমি জানতাম আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি তা রক্ষা করতে পারবেন না। কারণ তাঁর ব্যস্ততার সীমা নেই। আমাকে তিনি সময় দিয়েছেন শুধুমাত্র এই কারণে যে কাউকে তিনি না করতে পারেন না। যা ভেবেছি তাই তিনি আসতে পারলেন না। আমি বসে বসে তাঁর বসার ঘর লক্ষ্য করলাম। স্নিগ্ধ রুচির ছোঁয়া চারপাশে। দেখতে ভাল লাগে। পবিত্র কাবা শরীফের একটি বাঁধানো ছবি ঘরে আছে। আধুনিকতার নামে তিনি ধর্ম বিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। উনি এলেন রাত ন'টায়। আমাকে দীর্ঘ সময় বসে থাকতে দেখে লজ্জায় তাঁর অপরূপ মুখশ্রী রক্তবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু তিনি যে আমার সঙ্গে কথা বলবেন সেই সময় কোথায় একের পর এক টেলিফোন আসছে। তবু এর ফাঁকে-ও যখন শুনলেন আমি তৃষ্ণার্ত তিনি ছুটে গিয়ে নিজের হাতে এক গ্লাস

বরফ শীতল পানি নিয়ে এলেন। আমি তাঁর সৌজন্য ও ভদ্রতায় মোহিত হলাম।

নমুনা—২

(মন্দ রিপোর্ট)

এ দেশে কিছু কিছু তারকা (!) আছেন যারা মনে করেন এ্যপয়েন্টমেন্ট দিয়ে উপস্থিত না হওয়াটা তাদের তারকামূল্যের মাপকাঠি। যিনি যত বড় তারকা তিনি তত দেরী করবেন। মিস 'অ' হচ্ছেন এমন একজন। সন্ধ্যা ছ'টায় এ্যপয়েন্টমেন্ট করে আমি রাত ন'টা পর্যন্ত বসে রইলাম। মশার কামড় খেতে খেতে মিস 'অ'র রুচিহীন গৃহসজ্জা দেখে সময় কাটানো ছাড়া আমার কিছু করার নেই। দেয়ালে কামরুল হাসানের তরুণীর পেইনটিং-এর পাশাপাশি কাবা শরীফের বাঁধাই ছবি। শো কেসে দামী বিদেশী ডলের পাশে বঙ্গ সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা হিসেবে একটি তালের হাতপাখা। উঠতি ধনীদের মত যেখানে যত দামী জিনিস পয়েছেন মিস 'অ' তার সবই বসার ঘরে জড় করেছেন।

যাই হোক মিস 'অ'র এক সময় মর্জি হল তিনি এলেন এবং তিনি যে অসম্ভব ব্যস্ত তা প্রমাণ করবার জন্যে একটির পর একটি টেলিফোন করতে লাগলেন। আমি দীর্ঘ সময় তাঁর জন্যে বসে আছি জেনে তিনি অবশ্যি করুণাবশতঃ আধ গ্লাস ঠাণ্ডা পানি আমার সামনে রেখে গেলেন। আমি মনে মনে বললাম, হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন.....

তবে এই সমস্ত রিপোর্টারদের বেকায়দায় ফেলারও উপায় আছে। আমি কয়েকবার ফেলেছি। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। বৎসরখানিক আগে আমার ইন্টারভ্যু নিতে এক রিপোর্টার এলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝলাম অবস্থা ভাল না। এই লোক এসেছে আমাকে কাদায় ঠেলে ফেলবার জন্যে। কাজেই আমি উত্তরের ধরণ পাল্টে দিলাম। নমুনা দিচ্ছি—

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা আপনি কি স্বীকার করেন এ পর্যন্ত যা লিখেছেন সবই বাজে মাল?

উত্তর ঃ কেন স্বীকার করব না। এটাতো লুকিয়ে রাখার কোন ব্যাপার না। সবই রদ্দি জিনিস। পচা মাল।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখাগুলি কিন্তু বেশীর ভাগই হালকা।

উত্তর ঃ কারেক্ট। তবে আপনি বোধ হয় ভদ্রতা করে বলছেন বেশীর ভাগই হালকা। আসলে সবই হালকা। আপনি যেমন জানেন আমিও জানি। অন্যরাও জানে। পুরানো কথা তুলে কি লাভ?

প্রশ্ন ঃ জীবন সম্পর্কে আপনার কোন বোধ নেই।

উত্তর ঃ খুবই সত্যি কথা।

প্রশ্ন ঃ নাট্যকার হিসেবেও আপনি ব্যর্থ। কারণ এখন পর্যন্ত কোন নাটকে সমাজের প্রতি কোন কমিটমেন্ট আপনি দেখাতে পারেননি।

উত্তর ঃ একশ' ভাগ খাঁটি কথা। আমার নাটক মানেই ফালতু বিনোদন।

ভদ্রলোক যা বলেন আমি তাতেই রাজি হয়ে যাই। ইন্টারভ্যু আর কিছুতেই জমে না। এক সময় তাঁকে মুখ কালো করে উঠে পড়তে হয়। উঠতে উঠতে তিনি বলেন, আপনার এই সাক্ষাৎকার ছাপার কোন মানে হয় না। কেউ ইন্টারেস্ট পাবে না। এটা ছাপা হবে না।

ইন্টারভ্যুর এটাই হচ্ছে মূল কথা। পাবলিক ইন্টারেস্ট পাবে কি-না। যারা সাক্ষাৎকার দেন তাদের বেশীর ভাগই এটা বুঝতে পারেন না! তাঁরা মনে করেন প্রশ্নকর্তা বুঝি সত্যি সত্যি তাঁর সম্পর্কে জানতে চান। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে দীর্ঘ সময় ভ্যাজর ভ্যাজর করেন। পাবলিক মজা পায়। পত্রিকা বিক্রি হয়। ইন্টারভ্যুর এটাই হচ্ছে সার কথা।

আমি জীবনের প্রথম টিভি দেখি উনিশশো পঁয়ষট্টি সনে। তখন ঢাকায় প্রথম টিভি এসেছে। সৌভাগ্যবান কেউ কেউ টিভি সেট কিনেছেন। সে সব জায়গায় যাবার সুযোগ নেই। একদিন খবর পেলাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেলে একটা টিভি কেনা হয়েছে। গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখতে গেলাম। চৌকানো বাক্সের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত। একজন লোক খবর পড়ছে তার মাথা দুলছে, কোমর দুলছে, পা দুলছে। মাঝে মাঝে তার গায়ের উপর দিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। বড় চমৎকার লাগলো। নাচ এবং খবর একসঙ্গে। একের ভেতর দুই। আমি পাকিস্তানী পতাকা না দেখানো পর্যন্ত বসে রইলাম। সারাক্ষণই এরকম ঢেউ খেলানো ছবি। পরে শুনেছি রিসেপশন খারাপ থাকার কারণে নাকি ঐ কাণ্ড ঘটেছে। রিসেপশন ঠিক থাকলে নাকি অন্য ব্যাপার। তখন নাকি খুব চমৎকার দেখা যায়।

পরদিন আবার গেলাম। ঐ একই ব্যাপার। রিসেপশন ঠিক হচ্ছে না। শুনলাম টিভি সেটেই নাকি গণ্ডগোল। ইতিমধ্যে আমি ঢেউ খেলানো ছবিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমার নেশা লেগে গেছে। রোজ যাই। আমার সঙ্গে আরো অনেকে দেখে। তারাও আমার মত মুগ্ধ। টিভির সামনে থেকে নড়তে পারে না।

ঠিক রিসেপশনের টিভি একদিন দেখলাম। মোটেই ভাল লাগলো না। বড় সাদামাটা মনে হল। টিভির প্রতি আমার আগ্রহই গেলো কমে। আমার মনে আছে যখন ঢাকা কলেজ হোস্টেলে প্রথম টিভি এলো আমি দেখার মত কোন উৎসাহ খুঁজে পেলাম না। অনেকদিন টিভি রুমে যাইনি। তারপর আবার যাওয়া শুরু করলাম এবং আমার

নেশা ধরে গেলো। টিভি সেটের সামনে থেকে উঠতে পারি না।

এই ঘটনা দু'টি বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে এই চৌকানো বাক্স যা ইচ্ছা তা দেখিয়েও মানুষকে মুগ্ধ এবং নেশাগ্রস্ত করে ফেলতে পারে। শুধু মানুষ নয় পশু পাখিকেও।

নেচার পত্রিকায় কুকুরের টিভি-প্রীতি সম্পর্কে একবার একটা লেখা ছাপা হয়েছিলো। সেখানে বলা হয়েছে, সন্ধ্যাবেলা টিভি না ছাড়লে পোষা কুকুররা অস্থির হয়ে পড়ে তাদের ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়। ক্ষুধা কমে যায়। কুকুররা মানুষের মত আগ্রহ নিয়ে টিভি দেখে। তারা প্রেমের দৃশ্যগুলি সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে। সবচে' অপছন্দ করে মারামারির দৃশ্য।

সেদিন পত্রিকায় পড়লাম চীন দেশের এক কুকুর টিভিতে মারা-মারির দৃশ্য দেখে ভয়ে হার্ট ফেল করে ফেলেছে। কুকুরেরই যখন এই অবস্থা মানুষের কথা বাদই দিলাম। নিতান্ত আঁতেল যে ব্যক্তি (যার প্রিয় লেখক জেমস জয়েস ও বিষ্ণু দে) তাঁকেও দেখা যায়

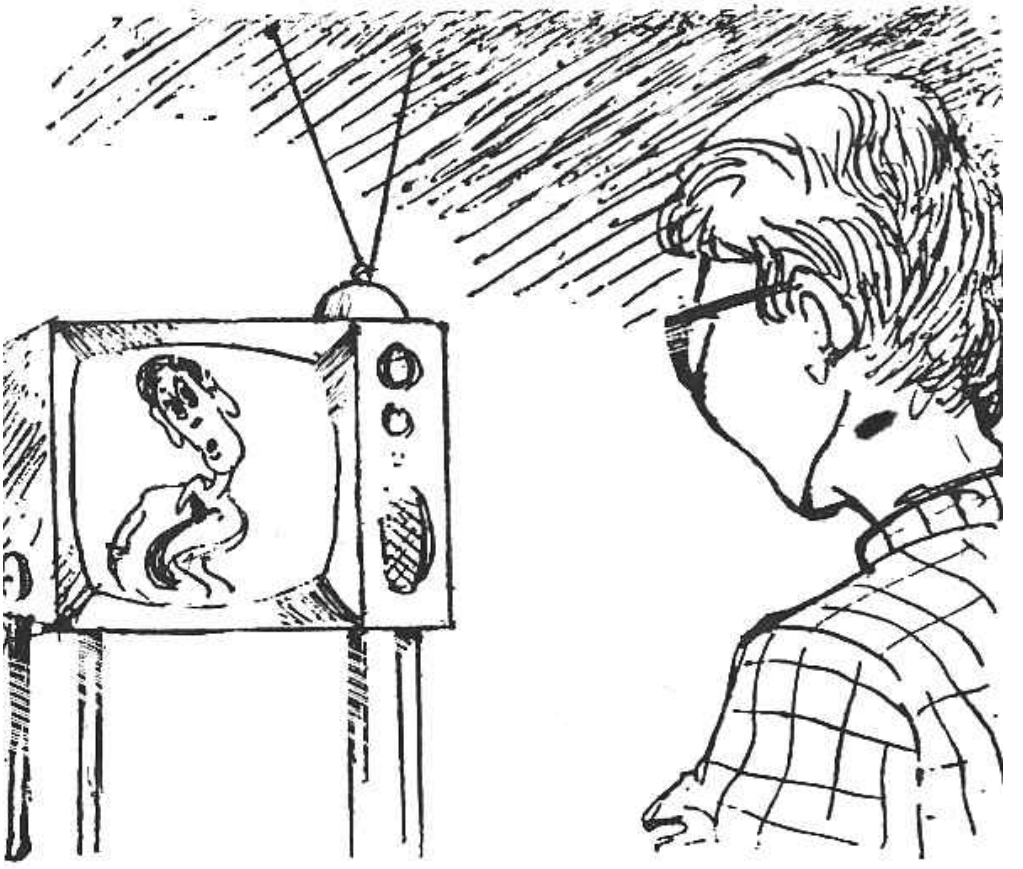

হা করে পর্দার সামনে বসে থাকতে। সেই 'হা'ও এমন বিকট হা যে আলজীব পর্যন্ত বের হয়ে থাকে। আমার পরিচিত একজন মহা অাঁতেল অধ্যাপক আছেন। জাঁ লুক গদার এবং ফেলিনি এই দু'জন চিত্রপরিচালক ছাড়া আর কোন পরিচালকের ছবি তিনি দেখেন না। নজরুলকে তিনি মনে করেন ছড়া লেখক। সেই তাঁর বাসায় একদিন সন্ধ্যায় গিয়েছি। অতি উচ্চমার্গের কথাবার্তা শুনছি। এক সময় তাঁর মেয়ে এসে বললো, টিভিতে বাংলা ছবি দেখাচ্ছে—'প্রেম পরিণয়', দেখবে না? অধ্যাপক বন্ধু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন—আমি প্রেম পরিণয় দেখবো কেন? মেয়েটি অবাক হয়ে বললো, তুমি তো সবগুলিই দেখ। এটা কেন দেখবে না? অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থা।

অধ্যাপক বন্ধু শুকনো গলায় বললেন—আসল ব্যাপারটা কি জানেন? খুবই আনএকসেপটেবল জিনিসও টিভির মাধ্যমে যখন আসে তখন একসেপটেবল মনে হয়। অধ্যাপক বন্ধুর কথা কতটুকু সত্যি আমি জানি না। কিছুটা হয়তো সত্যি যদিও আমার মনে হয় আমরা এই যন্ত্রটিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। ভাল লাগুক না লাগুক আমরা তাকিয়ে থাকি। পঁচিশজন (নাকি তিরিশ?) টিভি প্রযোজক মিলে আমাদের যা দেখান আমরা তাই দেখি। ব্যাপারটা কি ভয়াবহ নয়? এই পঁচিশজন টিভি প্রযোজক কি সূক্ষ্মভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছেন না? এরা যদি মনে করেন বাংলাদেশের দর্শকদের আমরা প্রতি সপ্তাহে একটি 'ভাঁড়ামো' ধরনের অনুষ্ঠান দেখাবো তাহলে আমাদের শুধু তাই দেখতে হবে। অন্য কিছু আমরা দেখবো না। এবং এক সময় আমরা ভাঁড়ামো ধরনের অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হয়ে যাব। নির্দিষ্ট সময়ে কিছু ভাঁড়ামো না দেখলে ভাল লাগবে না। বদ হজম হবে। ঘুম ভাল হবে না।

উদাহরণ দেই। নওয়াজীশ আলি খান নামের একজন প্রযোজক টিভিতে আছেন। চমৎকার মানুষ। হাসি-খুশী। মজার জিনিস খুব পছন্দ করেন। যেহেতু তিনি মজার ব্যাপারগুলি খুব পছন্দ করেন কাজেই তিনি প্রায় জোর করে আমাকে দিয়ে কয়েকটি হাসির নাটক লেখালেন। হাসির নাটক প্রচারিত হলো। দর্শকরা হাসির নাটক দেখলেন। নওয়াজীশ আলি খান নিজে যা দেখতে চাচ্ছিলেন দর্শকদের তিনি তাই দেখালেন।

আমি একবার একটা ভৌতিক নাটকও লিখেছিলাম। যে দু'জন

প্রযোজক আমার নাটক করেন তাদের কেউই ভূত-প্রেত পছন্দ করেন না বলে সেই ভৌতিক নাটক প্রচারিত হল না।

ঈদ উপলক্ষে একবার একটি নাটক লিখেছিলাম। চার্লস ডিকেন্সের একটি অসাধারণ গল্প—ক্রিসমাস ক্যারলের ভাবানুবাদ। বড়দিনের আগের রাতে এক কিপটে বদমাস বুড়ো তিনটি স্বপ্ন দেখল। এই তিনটি স্বপ্ন তার জীবনটা কিভাবে বদলে দিল তাই নিয়ে গল্প। আমার আগে বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়ও (বনফুল) ক্রিসমাস ক্যারলের অনুসরণে লিখেছিলেন—'পীতাম্বরের পুনর্জন্ম।'

নাটক প্রচারিত হল না। প্রযোজক বললেন—মরবিড গল্প ঈদ উপলক্ষে প্রচার করা যাবে না। অথচ আমার ধারণা যে ক'টি নাটক টিভির জন্যে লিখেছি ক্রিসমাস ক্যারল তাদের সবক'টিকে অনেক দূরে ফেলে এগিয়ে আছে।

আমি টিভির লোক নই। তবু পাকেচক্রে টিভির সঙ্গে অনেক সময় কাটাতে হচ্ছে। যে সব প্রযোজক সূক্ষ্মভাবে একটি জাতির মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ করছেন তাদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। কাউকে কাউকে বুঝতে পেরেছি। আবার অনেককে পারিনি। একদিনের কথা বলি—নাটক জমা দিয়ে ফিরছি। জনৈক প্রযোজক অত্যন্ত যত্ন করে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। মুখ করুণ করে বললেন, হুমায়ন সাহেব আপনি কি আমাকে একটা সত্যি কথা বলবেন?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই বলব। কেন্ বলব না?

লোকে বলে আমার নাকি "....." পেকে গেছে এটা কি সত্যি? সত্যি কি আমার ....." পেকেছে।

আমি স্তম্ভিত। বলে কি এই লোক।

টিভিতে প্রচার করা যাবে কি যাবে না সেই সম্পর্কে অদ্ভুত একটি নীতিমালা আছে। এই নীতিমালায় একজন প্রফেসরকে খারাপ চরিত্র হিসেবে দেখানো যাবে, ডাক্তারকে দেখানো যাবে, ইঞ্জিনিয়ারকে যাবে কিন্তু পুলিশকে যাবে না। তাদেরকে দেখাতে হবে মহাপুরুষ হিসেবে। মিলিটারীদের কথা ছেড়েই দিলাম। এই নীতিমালার বাইরেও সব প্রযোজকদের আলাদা আলাদা নীতিমালা আছে। কোন্ জিনিস তাঁরা দেখাবেন কোন্টা দেখাবেন না তা তাঁরা নিজস্ব পদ্ধতিতে ঠিক করেন। আমি একবার পেনসনভুগী বুড়োদের নিয়ে একটা নাটক লিখেছিলাম—দ্বিতীয় জন্ম। নাটকের এক জায়গায় দুই বুড়ো নৌকায় ভ্রমণ করছে। একজনের বাথরুম পেয়েছে। অন্যকে আড়াল করে সে বসেছে প্রস্রাব

করতে। বুড়োদের শ্লাডার দুর্বল থাকে এই কাজটি তাঁদের প্রায়ই করতে হয়। আমার ধারণা এটা সুন্দর একটি বাস্তব ছবি। প্রযোজক-এর মতে এটি অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ। প্রদর্শনের অযোগ্য। আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেলো।

প্রযোজকদের উপরে যারা থাকেন তাঁরা হচ্ছেন টিভি তারকারা। ক্যামেরা চালু করা মাত্র নাট্যকারের ডায়ালগের বাইরে তাঁরা নিজস্ব ডায়লগ দিতে থাকেন। প্রযোজক রেকর্ডিং-এ ব্যস্ত খেয়াল করতে পারেন না। অদ্ভুত অদ্ভুত ডায়লগ নাটকে ঢুকে পড়ে।

আমার এক হাসির নাটকে জনৈক অভিনেতা হাস্যরস আরো বাড়ানোর জন্যে বিধবাদের নিয়ে একটি রসিকতা করলেন। অথচ বৈধব্যের মত করুণ একটি ব্যাপার নিয়ে হাস্যরস তৈরী করা আমি কল্পনাও করি না।

কত সব কঠিন সমস্যা যে অভিনেত্রীরা তৈরী করেন। এবং বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কি ধরনের চাপ সৃষ্টি করেন তা জানেন প্রযোজক এবং অসহায় নাট্যকাররা। একটা ঘটনা বলি। চব্বিশ ঘন্টার রেকর্ডিং। আমার নাটকের এক প্রধান অভিনেতা আমাকে টেলিফোন করে জানালেন—'চরিত্রটি যেভাবে আছে সেভাবে থাকলে আমি অভিনয় করবো না। এটা এই জায়গায় বদলে দিতে হবে। আর যদি বদলে দিতে রাজি না হন তাহলে নতুন কাউকে দিয়ে অভিনয় করান। আমি এর মধ্যে নেই।'

অভিনেতা চাপ সৃষ্টির চমৎকার সময় বের করে নিলেন। তিনি জানেন চব্বিশ ঘন্টা পর রেকর্ডিং। এই অল্প সময়ে নতুন একজন অভিনেতা পাওয়া যাবে না। তাকেই রাখতে হবে।

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যে সব ঝামেলা করেন তার আরেকটা উদাহরণ দেই—এইসব দিনরাত্রির কবীর মামা। নাটকের খাতিরে তাঁকে মরতে হবে কিন্তু তিনি মরতে রাজি নন। বেঁচে থাকতে চান। মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব বহু কষ্টে তাঁকে মরতে রাজি করালেন। কবীর মামা তখন এক কাণ্ড করলেন। নিজের মৃত্যু দৃশ্য নিজেই লিখে নিয়ে এলেন। কুড়ি স্লিপের একতোড়া কাগজ। যেখানে কবীর মামা মৃত্যু শয্যায়। একটু পর পর উঠে বসছেন এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে আবার ঝিম মেরে যাচ্ছেন, খানিকক্ষণ পর আবার উঠে বসছেন এবং আরেকটি কবিতার অংশ বিশেষ আবৃত্তি করছেন—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী

ভয় নাই ওরে ভয় নাই.....ইত্যাদি।

এইসব দিনরাত্রির শাহানা। তার একটি ছেলে হবে। কিন্তু গর্ভবতী অবস্থায় সে টিভিতে আসবে না। এটা নাকি তার ইমেজ নষ্ট করবে। উঁচু পেট নিয়ে সে নাটক করবে না। শেষ পর্যন্ত করলই না। পত্রিকায় ইন্টারভ্যুতে বললো—হুমায়ূন আহমেদের ঔচিত্যবোধ নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, একদিন মঞ্চ নাটক দেখতে গেছি হঠাৎ দেখি এইসব দিনরাত্রির শাহানা। মা হচ্ছে সেই আনন্দে ঝলমল করছে। আমি হেসে বললাম, এত বড় পেট নিয়ে এত লোকজনের সামনে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে—কি এখন লজ্জা লাগছে না? মেয়েটি মাথা নীচু করলো, সম্ভবতঃ বুঝলো মাতৃত্বের জন্যে যে শারীরিক অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। কিংবা কে জানে হয়তো বুঝলো না।

এর বিপরীত ছবিও আছে। সেই ছবির কথা না বললে খুব বড় অন্যায় করা হবে। একজন অভিনেতার বোন মারা গেছেন। অতি আদরের বোন। পরদিন আমার একটি নাটকের রেকর্ডিং। তিনি চোখ মুছে নাটক করতে এলেন। তাঁর ভয়াবহ ট্রাজেডির কথা কেউ জানলো না। এইসব দিনরাত্রির সঙ্গীত পরিচালকের ছোট্ট মেয়েটি পানিতে ডুবে মারা গেছে। তিনি হৃদয়ে পাথর বেঁধে এইসব দিনরাত্রিতে মিউজিক বসাতে এলেন।

চোখের জলে মিউজিকের নোটেশন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তাতে কি—নাটক হবে। যথাসময়ে দর্শক দেখবে। এর পেছনের আনন্দ বেদনার ইতিহাস দর্শকদের জানার কোন প্রয়োজন নেই।

প্রযোজকের গায়ে একশ' চার জ্বর। অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি রেকর্ডিং-এ এসেছেন। চোখ রক্তবর্ণ। আজ তাঁর নাটক আছে। তিনি নাটক ফেলে ঘরে শুয়ে থাকতে পারছেন না। ডাক্তারের নিষেধ, স্ত্রীর অনুরোধ সব অগ্রাহ্য করে ছুটে এসেছেন—Show must go on.

এক সন্ধ্যায় স্টুডিওতে গিয়ে দেখি "একদিন হঠাৎ" নাটকের রহিমার মা ছটফট করছেন। যন্ত্রণায় এই বৃদ্ধা মহিলার ফর্সা মুখ নীল হয়ে গেছে। আমি বললাম—কি হয়েছে আপনার?

তিনি কাতর গলায় বললেন—আলসার আছে। ব্যথা উঠেছে। সহ্য করতে পারছি না।

এক সময় রেকর্ডিং-এর জন্যে ডাক পড়লো তিনি ঝাড়ু হাতে

গেলেন, অভিনয় করলেন। দর্শকরা সেই অভিনয় দেখে খুব হাসলেন।

কত অজস্র উদাহরণ। এইসব উদাহরণের কথা আমরা মনে রাখি না। খারাপ দিকগুলিই শুধু মনে থাকে। আমাদের কষ্ট দেয়, ব্যথিত করে।

একজন নাট্যকারকে অনেক বাধা অতিক্রম করে লিখতে হয়। সরকারী বাধা, প্রযোজকদের বাধা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চাপ। এতসব ঝামেলা কাঁধে নিয়ে অন্য নাট্যকাররা কেন লেখেন আমি জানি না। আমি কেন লিখি তা বলছি। তার আগে একটা গল্প বলে নেই।

গ্রামের এক কুমারী মেয়ে হঠাৎ গর্ভবতী হয়ে গেলো। সবাই ভাবলো—বাচ্চা মেয়ে বুঝতে পারেনি একটা ভুল হয়ে গেছে। ঘটনাটা কোন রকমে ধামাচাপা দেয়া হল। কিছুদিন পর দেখা গেলো মেয়ে আবার গর্ভবতী। গ্রামের লোকজন সেবারও ঘটনাটা সামলে নিল। কি সর্বনাশ তৃতীয় বৎসরে আবার এই কাণ্ড। সালিশ বসলো। মেয়েকে ডেকে মোড়ল বললেন—ও রহিমা, ব্যাপারটা কি ?

রহিমা ক্ষীণ কণ্ঠে বললো—আমি কাউকে না বলতে পারি না। না বলতে আমার লজ্জা লাগে।

আমিও ঐ রহিমার মত। কাউকে না বলতে পারি না। কেউ যখন আমার কাছে নাটক চান আগ্রহ নিয়ে বলেন—আমাকে একটা নাটক দেবেন ?

আমি বলি দেব।

ছিলাম গল্প উপন্যাস নিয়ে সেখানেই থাকতাম। নওয়াজীশ আলি খান একদিন বললেন—একটা নাটক লিখে দিন।

যেহেতু না বলতে পারি না—দিলাম।

মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব বললেন—ধারাবাহিক নাটক দিন।

তাও দিলাম।

ঈদের নাটক যখন চাওয়া হল তখনও না করতে পারলাম না। বললাম—লিখে দেব একটা হাসির নাটক।

কি কষ্ট সেই নাটক নিয়ে। দু'এক পাতা লিখি, অন্যদের পড়ে শোনাই কেউ হাসে না। আরো গম্ভীর হয়ে যায়। হাসির নাটক লেখা এত কষ্ট কে জানতো। মাঝে মাঝে মনে হয় এইতো হচ্ছে বেশ সুন্দর হাসির সিকোয়েন্স। কিছুক্ষণ পরে সেই লেখা পড়লে মনে হয় পাগলা গারদের পাগল ছাড়া এই নাটক দেখে কেউ হাসবে না।

লিখি, ছিঁড়ে ফেলি আবার লিখি আবার ছিঁড়ে ফেলি। রাতে ঘুম হয় না দুঃস্বপ্নে দেখি। ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন! একদল লোক দাঁত বের করে আমাকে কামড়াতে আসছে। একদিন শুনি আমার বড় মেয়ে টেলি-ফোনে তার বান্ধবীকে বলছে—জানিস, আমার বাবার না খুব মেজাজ খারাপ। সারাদিন সবাইকে ধমকাধমকি করছে। হাসির নাটক লিখছে তো এই জন্যে।

যথাসময়ে নাটক শেষ করি। প্রচারিত হয়। লেখা এবং প্রচারের মাঝখানের বিচিত্র সব স্মৃতি আমি মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াই। তার খবর দর্শকরা রাখেন না। রাখার কথাও নয়।

এখন কেন জানি মনে হচ্ছে যথেষ্ট তো হয়েছে। সিন্দাবাদের ভূতের মত অনেকদিন টিভির ঘাড়ে চেপে রইলাম। এইবার 'না' বলাটা রপ্ত করে নেব। নিজেও বাঁচব দর্শকদেরও বাঁচাবো। একই কুমীরের বাচ্চা কতবার আর দেখান যায়?

কোন একটা পত্রিকায় যেন এই রসিকতাটা পড়েছিলাম। খুব সম্ভব সাপ্তাহিক দেশ। একজন ডাক্তারকে নিয়ে গল্প।

রুগী এসেছে ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বললেন, আপনার সমস্যাটা কি ? রুগী বলল, সমস্যারতো কোন কুলকিনারা নাই। শরীরে বাত, সকাল সন্ধ্যা জ্বর, কাশি আছে, হাঁপানি আছে। পেটের ট্রাবল দীর্ঘদিন ধরে। ইদানিং আমাশা হয়েছে। যুবক বয়সে যক্ষ্মা হয়েছিল। ছোট-বেলায় হয়েছিল হুপিং কফ। এখন চোখেও কম দেখি। আর এই দেখুন গায়ে কি যেন চাকা চাকা বের হয়েছে।

ডাক্তার সাহেব বললেন—এক কাজ করুন, ঝড় বৃষ্টির সময় সাত ফুট লম্বা একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে মাঠে হাটাহাটি করুন।

ঃ কেন ?

ঃ আপনারতো সবই হয়েছে শুধু বজ্রপাতটা বাকি। এইটাই বা বাদ থাকবে কেন ? বজ্রপাতও হয়ে যাক।

রসিকতাটা আপনাদের কেমন লাগল জানিনা আমার নিজের বিশেষ ভাল লাগে নি। নির্মম রসিকতা। হাসি আসার বদলে ডাক্তারের উপর খানিকটা রাগই হয়। এই রকম একজন ডাক্তারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। নাম খবিরুদ্দিন। এলএমএফ ডাক্তার। বিশেষজ্ঞ নন বলেই ডাক্তারী কিছু জানেন। অষুধ খেলে রোগ সারে। তবে নৈবদ্যের উপর সন্দেশের মত প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে কিছু কঠিন কঠিন কথাবার্তা বলেন। রুগীরা তা সহ্য করে নেয়। গ্রাম্য প্রবচন আছে না—যে গরু দুধ দেয়.....।

ডাক্তার খবিরুদ্দিনের কাছেই আমি প্রথম শুনলাম যে বদহজমে

যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় অবিকল একই লক্ষণ প্রকাশ পায় প্রেমে পড়লে। বুক জ্বালা, অস্বস্তি, মাথা ঘুরা, রক্তচাপ বৃদ্ধি, পিপাসা বোধ এবং অনিদ্রা। তাঁর মতে প্রেম এবং বদহজম এ দু'টি আসলে একই জিনিশ। এক বৃন্তে দু'টি ফুল। এবং তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন বদহজমের অষুধ দিয়ে প্রেম রোগ সারানো যায়।

আমি বললাম, আপনি প্রেমকে তাহলে রোগ হিসেবে দেখছেন? ডাক্তার খবিরুদ্দিন অবাক হয়ে বললেন, রোগ কে রোগ হিসেবে দেখব না? প্রেম হচ্ছে একটা ভাইরাস গঠিত ব্যাধি। সায়েন্স আরো ডেভেলপ করলে প্রেমের ভাইরাস আবিস্কার হবে। হতেই হবে। ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করতে পারি না। যা করি তা হচ্ছে সিমটোমেটিক চিকিৎসা। প্রেমের ক্ষেত্রেও তাই। সিমটোমেটিক চিকিৎসা করবেন রোগ সারবে।

রোগের দৃষ্টিকোন থেকে ডাক্তার খবিরুদ্দিন প্রেমকে এই ভাবে দেখেন।

১। বার বছর থেকে নব্বুই বছর পর্যন্ত যে কোন সময়ে এই রোগের সংক্রমণ হতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে এই রোগ সাধারণত জটিল আকার ধারণ করে।

২। বয়োসন্ধি কাল এই রোগের প্রকৃষ্ট সময়। বয়োসন্ধি কালে রোগের বেশ কয়েকটি সংক্রমণ হতে পারে। তবে আশার কথা রোগ কখনো গুরুতর আকার ধারণ করে না।

৩। এই রোগ পুরুষের যতটা কাবু করে মেয়েদের ততটা কাবু করতে পারে না। মেয়েরা এই রোগে আক্রান্ত হলেও তাদের মধ্যে রোগ লক্ষণ কদাচ প্রকাশ পায়।

৪। বিবাহ নামক সামাজিক প্রথা এই রোগে ভ্যাকসিনের কাজ করে। বিবাহিত নর-নারীর খুব অল্প সংখ্যকই এই রোগে আক্রান্ত হন তবে আক্রান্ত রোগ অতি দ্রুত জটিল আকার ধারণ করে।

ডাক্তার খবিরুদ্দিন প্রেমকে শুধু যে রোগ হিসেবেই দেখেছেন তাই না। প্রেমের দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র মানবজাতিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এবং এই চার শ্রেণীর জন্যে পৃথক পৃথক চিকিৎসার বিধানও দিয়েছেন। শ্রেণী ও বিধান পুরুষের জন্যে প্রযোজ্য।

ক শ্রেণী বা বিশ্ব প্রেমিক শ্রেণী

এই শ্রেণীর পুরুষ মহিলা দেখা মাত্র প্রেমে পড়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ

কঠিণ ডিসপেপসিয়ার সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ পাবে। ব্লাড প্রেসার বৃদ্ধি পাবে, রক্তে শর্করার পরিমাণ নিম্নগামী হবে। শ্বাস কষ্ট হবে। কবিতা রচনা করলে রোগের কিঞ্চিৎ আরাম হবে। প্রেমিকার কাছে দীর্ঘ পত্র রচনা করলেও ব্যাধির প্রকোপ খানিকটা কমে। প্রেমিকার একগুচ্ছ চুল সঙ্গে রাখলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। রক্তচাপ কমাবার অষুধ খাওয়ানো যেতে পারে।

খ শ্রেণী বা অনুকুরণ শ্রেণী

শরৎচন্দ্রের দেবদাসের সঙ্গে এই শ্রেণীর বড় রকমের মিল দেখা যায়। মিলের মূল কারণ অনুকরণ প্রবণতা। এদের মধ্যে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেলেই উপন্যাস অথবা সিনেমার প্রেমিক চরিত্রের অনুকরণে সচেষ্ট হয়। ছাত্র হলে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। কেউ কেউ লম্বা চুল দাড়ি রাখে। এদের কিছু অংশ পরবর্তী সময়ে গাঁজা ও পেথিড্রিন জাতীয় নেশায় আসক্ত হয়। এই রোগে সিমটোমেটিক চিকিৎসা খুব ফলদায়ী। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্যি "প্রহার" খুব চমৎকার কাজ করে।

গ শ্রেণী বা বিপরীত শ্রেণী

প্রেমে পড়লে এই শ্রেণীর মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের স্বভাব প্রকাশ পায়। পুরুষ মহিলাদের মত আচরণ করে। লজ্জা, ব্রীড়া, এইসব দেখা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে প্রেমে পড়া মাত্র কোষ্ঠ কাঠিণ্যের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মিল্ক অব মেগনেশিয়া এদের জন্যে খুব উপযোগী। বিবাহ নামক সামাজিক প্রথা এদের জন্যে ম্যাজিকের মত কাজ করে। বিবাহিত পুরুষ কখনো এই রোগের কবলে পড়ে না।

ঘ শ্রেণী বা বেকুব শ্রেণী

এরা নিজেরা কারোর প্রেমে পড়ে না তবে অন্যরা তাদের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে বলে ধারণা পোষণ করে। এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই। বিবাহের পরে এই রোগের প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পায়।

ডাক্তার খবিরুদ্দিনের প্রেম বিষয়ক থিসিসের যৌন অংশও আছে। এই বিষয় নিয়ে লেখালেখিতে আমার নিজের খানিকটা ইনহিবিসন আছে বলে লিখলাম না। পাঠক-পাঠিকারা চাইলে পরবর্তি উন্মাদে ডাক্তার খবিরুদ্দিনের ঠিকানা দিয়ে দিতে চেষ্টা করব। তবে আগে ভাগেই বলে রাখি ডাক্তার খবিরুদ্দিন ঘ বা বেকুব শ্রেণীর। এবং আমি নিজে হচ্ছি.....না থাক বলে কাজ নেই।

উন্মাদ পত্রিকায় একেকটি এলেবেলে প্রকাশিত হয়—আর আমি বেশ কিছু চিঠিপত্র পাই। সেই সব চিঠির ভাষা, ভঙ্গি ও মন্তব্য এমনই যে প্রতিবারই ইচ্ছা করে লেখালেখি ছেড়ে পুরোপুরি সংসারী হয়ে যাই। এরকম একটি চিঠির নমুনা আপনাদের কাছে পেশ করছি। নারায়ণগঞ্জ থেকে জনৈক মোবারক হোসেন খাঁ লিখছেন—

আপনি না জানিয়া মূর্খের মত এলেবেলে নামক রচনা কেন লিখেন? পয়সার জন্য আপনার এত লালচ কেন? আপনি একবার লিখিলেন—বিবাহের ভোজসভায় তিন নম্বর চেয়ারে বসিতে হয়। কারণ রেজালার বাটি রাখা হয় তিন নম্বর চেয়ারের সামনে। আপনারা লেখকরা যা মনে আসে তাই লেখেন এবং পাঠকদের বিভ্রান্ত করেন। এই অধিকার আপনাদের কে দিল?

মোবারক হোসেন খাঁ সাহেব চিঠিতে আমাকে পরামর্শও দিলেন যার একটি হচ্ছে 'দূর্বা ঘাস ভক্ষণ। চিঠি পড়ে আমি যত রাগই করি না কেন একটি জিনিস স্বীকার করতেই হয় তা হচ্ছে—লেখকরা পাঠকদের সত্যি সত্যি বিভ্রান্ত করেন। ছাপার অক্ষরে যা পড়ি তা বিশ্বাস করার প্রবণতা আমাদের আছে। যার জন্য পরবর্তী সময়ে বিভ্রান্ত হতে হয়।

লেখা পড়ে আমি নিজে একবার মোবারক হোসেন সাহেবের মতই বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। শৈশবের ঘটনা। পড়ি ক্লাস ফোরে। সেই সময় "এক বৃন্তে দু'টি ফুল" নামের একটি বই পড়ে প্রথম জানতে পারি যে প্রেম একটি স্বর্গীয়, মহৎ এবং অতি উঁচু স্তরের ব্যাপার।

আমি আমার সদ্যলব্ধ জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগালাম। আমাদের

পাশের বাসার পরী নামের এক বালিকাকে ডেকে কাঁঠাল গাছের নিচে নিয়ে গেলাম। ফিস ফিস করে বললাম—পরী, আমি তোমাকে ভালবাসি।

পরী চোখ বড় বড় করে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—তুই অসভ্য।

মেয়েরা পেটে কথা রাখতে পারে না। কাজেই পাঠক-পাঠিকারা আমার অবস্থা সহজেই অনুমান করতে পারেন। গল্পের বই (সে সময় এদের বলা হত আউট বই) আমার জন্যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। যে প্রাইভেট মাস্টার আমাদের তিন ভাই-বোনকে পড়াতেন আমি কোন পড়া না পারলে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে বলতেন—প্রেম সাগর! লাইলী-মজনু করে সময় পাস না পড়বি কখন

আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে একজন মহিলা সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে নিলেন তিনি হচ্ছেন পরীর মা। আমাকে দেখলেই তিনি হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়তেন এবং বলতেন—এই যে জামাই। কেমন আছ?

তিনি আমাদের বাসায় বেড়াতে এসে মা'কে বলতেন—জামাইয়ের টানে এসেছি। বেচারা এই বয়সেই আমার মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছে। আমি কিন্তু আপা এদের বিয়ে দিয়ে দেব। আপনাদের কোন কথা শুনব না। এরকম প্রেমিক জামাই পাওয়া ভাগ্যের কথা। হি হি হি।

শৈশবের এই ঘটনার কারণেই পরবর্তী জীবনে কোন তরুণীকে—"আমি তোমাকে ভালবাসি" এই কথা বলা হয়নি। এরচে' বড় ট্রাজেডি একজন যুবকের আর কি হতে পারে?

বই পড়ে পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়েছেন এরকম আরেকজনের কথা বলি। পুরানা পল্টনে থাকার সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয়। এজি অফিসে কাজ করেন। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। রোগা, নার্ভাস ধরনের একজন মানুষ। আমার পাশের ফ্লাটে থাকেন। এক ছুটির দিনে আমার কাছে এলেন। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ বললেন—আচ্ছা ভাই, অনেকদিন থেকেইতো আপনি আমাকে দেখছেন। কখনো কি অদ্ভুত কিছু লক্ষ্য করেছেন?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—না তো।

ঃ আমি মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাই।

ঃ সে কি!

ঃ বুঝতে পারছি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না কিন্তু ঘটনা সত্যি।

ঃ আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনি অদৃশ্য হয়ে যান?

ঃ জ্বি। পুরোপুরি অদৃশ্য—কেউ আমাকে দেখে না। ঘটনাটা কি ভাবে হয় আপনাকে বলি। ক্লাস এইটে যখন পড়ি তখন "সোলায়-মানি যাদু" নামের একটা বই আমার হাতে আসে। অনেক রকম যাদুবিদ্যা আছে এই বইটাতে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে অদৃশ্য হবার যাদু। অনেক কিছু লাগে সেই যাদুতে যেমন শ্মশানের ভাঙ্গা কলসির মুখ, কুমারী মেয়ের মাথার চুল, সাত নদীর পানি এই সব। তখন বয়স কম ছিল উৎসাহ ছিল বেশী। সব যোগাড় করে মন্ত্রটা পড়ি।

ঃ তারপর থেকেই আপনি অদৃশ্য?

ঃ জ্বি না। সব সময় না। মাঝে মাঝে আমি অদৃশ্য হয়ে যাই। কেউ আমাকে দেখতে পায় না।

ঃ বলেন কি?

ঃ সত্যি কথাই বলছি ভাই। মনে করুন কোন রেস্টুরেন্টে আমি চা খেতে গেলাম। দোকানে ঢুকামাত্র আমি অদৃশ্য হয়ে যাব।

দোকানের কোন 'বয়' আমার ডাকে আসবে না। আমি যে টেবিলে বসব সেই টেবিলে আরো কতজন আসবে চা খাবে আবার চলেও যাবে—আমি কিন্তু বসেই থাকব। একটু পর পর বলব—"এই যে ভাই, শুনুন, এক কাপ দিতে পারবেন। হ্যালো, ভাই একটু এদিকে।" কোনই লাভ হবে না।

ভদ্রলোক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রলোক বললেন—চায়ের দোকানের বয়দের দোষ দিয়ে লাভ নেই—আপনার কথাই ধরুন। প্রায়ই আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় দেখা, নামবার সময় দেখা। কখনো আপনি আমার সঙ্গে একটা কথা বলেন না। আপনারইবা দোষ কি? কেন বলবেন? আপনিতো আর আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। আমি অদৃশ্য। যখন কোন পার্টি-টার্টিতে যাই সেখানেও এই অবস্থা। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। চুপচাপ এক কোণায় একা বসে থাকি। কেউ আমাকে দেখতে পাচ্ছে না বলেই কাছে আসছে না ওদেরতো দোষ নেই। আমার নিজের স্ত্রীর বেলায়ও তাই। বেশীর ভাগ সময়ই তার কাছে আমি অদৃশ্য। পাশাপাশি থাকি অথচ একটা কথা বলে না। ওর দোষ কি বলুন? অদৃশ্য কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলা যায়?

ঃ তাতো বটেই।

ঃ বড় যন্ত্রণায় পড়েছি ভাই। আপনার কাছে কি যাদু কাটানোর কোন বইপত্র আছে?

তবে বইপত্র না পড়েও কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়। যেমন আমাদের পাড়ার রিটায়ার্ড এস. পি আব্দুল মজিদ সাহেব। তিনি বিভ্রান্ত হন গান শুনে। কারণ ইদানীং তাঁর হাতে কোন কাজকর্ম না থাকায় প্রচুর গান শুনেন এবং গানের কথাগুলি তাঁকে বিভ্রান্ত করে। যেমন একদিন আমাকে এসে বললেন—প্রেমের মরা জলে ডুবে না এর মানে কি বলুনতো? জলে কেন ডুববে না? পুলিশে চাকরি করেছি ডেড-বডি নিয়ে আমাদের কারবার। যে কোন মরা তা সে প্রেমেরই হোক কিংবা প্লেইন এণ্ড সিম্পল মার্ডার কেইসই হোক পানিতে ছাড়লেই ডুবে যাবে। কয়েকদিন পর ডেডবডির ভেতরে যখন গ্যাস হবে তখন ভেসে উঠবে। কি বলেন ঠিক না?

ঃ হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন।

ঃ তাহলে এইসব উল্টাপাল্টা কথা কেন লেখে বলেনতো? আপনাদের রবিঠাকুরেরও এই অবস্থা।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ হ্যাঁ। উনার একটা গান আছে—ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। চাবি ভাঙ্গলে ঘর খুলবে কি করে ? ঠিক না ?

ঃ খুবই ঠিক।

ঃ কি করা যায় বলুনতো প্রফেসর সাহেব ?

মজিদ সাহেবকে কিছু বলতে পারলাম না। কারণ চাবি ভাঙ্গার ব্যাপারটা আমাকেও ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। আমরা সবাই কোন না কোনভাবে বিভ্রান্ত। কিভাবে এই বিভ্রান্তি কাটবে কে জানে।